আজাদ-হিন্দ গ্রন্থমালা

নেতাজী ও আজাদ-হিন্দ-ফৌজ

নেতাজী
ও
আজাদ-হিন্দ ফৌজ

জ্যোতিপ্রসাদ বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বেঙ্গল পাব্লিশার্সের পক্ষে প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, মানসী প্রেসের পক্ষে মুদ্রাকর—শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও, বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স।

আড়াই টাকা

প্রথম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩

আজাদ-হিন্দ গ্রন্থমালা

প্রথম বই : দিল্লী চলো—নেতাজী সুভাষচন্দ্র

দ্বিতীয় বই : মুক্তি পতাকা তলে—নীহাররঞ্জন গুপ্ত

তৃতীয় বই : নেতাজী ও আজাদ-হিন্দ-ফৌজ—জ্যোতিপ্রসাদ বসু

চতুর্থ বই : আরাকান ফ্রন্টে—শান্তিলাল রায়

নেতাজীর প্রতিকৃতি মাথায় নিয়ে আজাদ-হিন্দ-ফৌজ

লেঃ কঃ শাহ নওয়াজ

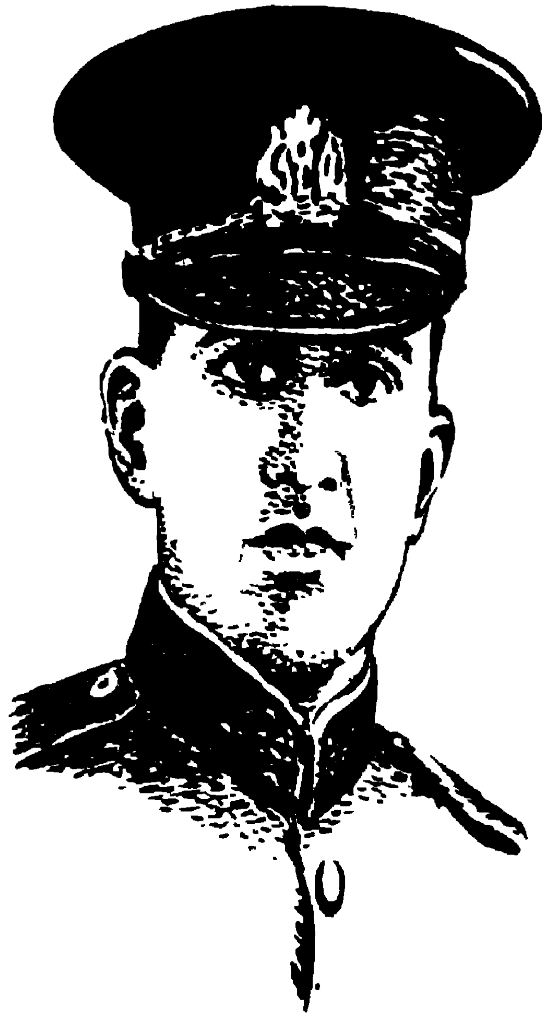

কর্ণেল পি কে সেহ্গল

ক্যাপ্টেন গুরুবক্স ধীলন

'অভী অভী হুংকার নাদিত প্রচণ্ড সংগ্রাম নৃত্যম্
বন্দে ভারত ভানু সুভাষম্'

জীবনের ধারা

১

সূর্য ওঠে। শত ঝড়, শত ঝঞ্ঝা, শত অভিশপ্ত রাত্রির শেষে সূর্য ওঠে পূর্ব দিগন্তে। সূর্য ওঠে চিরলাঞ্ছিত, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত এই বাঙ্গলার মাটিতে,—ভারতের পূর্ব সীমান্তে।

রত্নগর্ভা এই দেশ। যুগে যুগে কত মানুষ-সূর্যের অভ্যুদয় হয়েছে এই দেশে, যাঁরা সকল সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়ে সমস্ত ভারতকে ডাক দিয়েছেন বৃহত্তর জীবনের দিকে, বৃহত্তর মানবতার পানে। শত দুর্ভিক্ষ শত মহামারীতেও যার ক্ষয় নেই, শেষ নেই। এ সেই বাঙ্গলার আকাশেই এক নতুন সূর্যের অভ্যুদয়—শতাব্দীর সূর্য, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

এবারের সূর্যের কিন্তু দক্ষিণায়নের পালা। তাই সে উঠলো একটু দক্ষিণ ঘেঁষে—কটকে। তারিখটা প্রত্যেক বাঙ্গালীরই মনে আছে ২৩শে জানুয়ারী, ১৮৯৭ সাল—বেলা দেড়টার সময় এক নতুন শিশু চোখ মেললো আলোর জগতে। সেই শিশুই যে একদিন ভারতের আঁধার আকাশে আলো দেখিয়ে নিয়ে যাবে উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের পানে, কে জানতো? কে জানতো এই কোমল শিশুর মধ্য দিয়ে একদা জন্ম নেবে বিপ্লবের সুর?

সুভাষচন্দ্রের বাবা রায় বাহাদুর জানকীনাথ বসু উড়িষ্যার রাজধানী কটকে ওকালতি করতেন। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসামান্য প্রতিভা বলে তিনি ওখানকার শ্রেষ্ঠ আইন ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছিলেন। তাছাড়া তিনি অনেক দিন পাব্লিক প্রসিকিউটর ও জিলা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের মহাভাগ্যবতী জননী প্রভাবতী দেবী অত্যন্ত সরলপ্রাণা ও ধর্মভাব-পরায়ণা মহিলা। তাঁর সংশিক্ষার গুণে সুভাষচন্দ্রের ভাই বোনেরা সহজ সরল ও অনাড়ম্বর পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। বহু মহামানবের জীবনে যেমন দেখা গিয়াছে সুভাষচন্দ্রের জীবনেও তেমনি দেখা যায় যে তাঁর এই বিরাট প্রতিভার পশ্চাতে রয়েছে তাঁর মাতার স্নেহ, শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা। এবং তাঁর মায়ের স্বভাবগুণেই সুভাষের জীবনের ওপর সাধারণ ধর্মভাব খুব প্রভাব বিস্তার করেছিল। আধুনিক জগতের বহু বিপ্লবী জননায়কের জীবনে যেমন দেখা যায় যে তাঁদের জীবনে শুধু একটা দিকই বড় হয়ে দেখা দেয়,—বিপ্লব, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের বাহ্যিক জীবনের পশ্চাতে রয়ে গেছে একটা স্বভাব কোমল অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ একটি সহজ সুন্দর অধ্যায়। এই দিক থেকে সুভাষের জীবনের সঙ্গে অনেকে স্ট্যালিনের জীবনের মিল খুঁজে পেয়েছেন! স্ট্যালিনও অত্যন্ত ধর্মভাবের আবহাওয়ার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মায়ের কাছ থেকে তিনি ধর্মানুপ্রেরণা পেয়েছিলেন খুবই। এমন কি তাঁর মায়ের ইচ্ছা ছিল যে স্ট্যালিন বড় হয়ে একজন ধর্মযাজক হবেন। কিন্তু এইখানেই স্ট্যালিনের মায়ের ও সুভাষের মায়ের মধ্যে প্রভেদ। সুভাষের মা কোনদিন চান নি যে সুভাস বড় হয়ে ধর্মনায়ক হয়ে উঠবে, তিনি চেয়েছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র সুভাষ অন্যান্য কৃতী সন্তানদের মতই সকল দিকে সাফল্যলাভ করবে। তবে সমস্ত ব্যবহারিক জীবনের পশ্চাতে এক সহজ সুন্দর ধর্মভাব আরও মহত্তর সার্থকতার দিকে মানুষকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়—এই যে ভারতীয় সাধনার মূল নির্দেশ এইটেই তিনি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন সুভাষের জীবনে। এবং সেই দিক থেকে সুভাষের জীবনে এই আদর্শের এতটুকুও ব্যতিক্রম দেখা যায় নি।

সুভাষচন্দ্রের আরও ছয়জন ভাই—সকলেই তাঁর থেকে বড়, জীবিত সকলেই জীবনে লব্ধ প্রতিষ্ঠ—কেউ আইন ব্যবসায়, কেউ চিকিৎসাবিদ্যায়। তাই কিশোর সুভাষ যখন প্রোটেষ্ট্যান্ট ইউরোপীয়ান স্কুলে গিয়ে ভর্তি হলেন তখন আর একটি

সফলকাম জীবনের সম্ভাবনা দিবালোকের মত স্বচ্ছ হয়ে উঠলো। কিন্তু কেউ কি আশা করতে পেরেছিল এই কিশোরের জীবন সমস্ত ভারতীয় জীবনকে এক নতুন দিবালোকে উজ্জল করে তুলবে ?

প্রোটেষ্ট্যান্ট ইউরোপীয়ান স্কুল খুব অভিজাত স্কুল ঐ অঞ্চলে। অত উচ্চস্তরেব স্কুলে সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেদের পড়া সম্ভব নয়। কিন্তু সুভাষচন্দ্রেব বাবার অবস্থা সকল দিক দিয়েই খুবই অভিজাত। তাই তাঁকে ঐ স্কুলে থেকেই প্রথম জীবনেব লেখাপড়া সমাপন করতে হয়েছিল। সেই সময়ে তাঁর মনে এই দিক দিয়ে কোন প্রতিক্রিয়া হয়েছিল কি না তা কিশোর জীবনে প্রকাশ পাওয়াব সুযোগ পায় নি। তবে কলেজী জীবনে তার আত্মপ্রকাশ আমরা পরে জানতে পারবো।

এই স্কুলে সাত বছর পড়বার পর প্রাইমারী পড়া শেষ করে সুভাষচন্দ্র র‍্যাভেনশ কলোজিয়েট স্কুলে এসে ভর্তি হলেন। এবং এখান থেকেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন। এই সব বড়লোকেব ইস্কুলে—বড়লোক ছেলেদের সঙ্গে পড়েও তাঁর এই কৃতিত্বে সকলে অবাক হয়ে গেল। কারণ এই রকম বিলাসী আবহাওয়ার মধ্যে সচরাচর এমনটা ঘটে না। তাছাড়া তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় পড়ার বই ছাড়া অন্যান্য নানা ধরণের বই পড়ে কাটতো। সেই সব বইয়ের মধ্যে ধর্মপুস্তকের সংখ্যাই বেশী। গোড়ার দিকেই বলেছি তিনি ছোটবেলা থেকেই ধর্ম্মভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। তার পর স্কুলে এসে হেডমাষ্টার বেণীবাবুর সাহচর্যে তিনি আরও বেশী উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বেণীবাবুই তাঁকে প্রথম দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেন। তাছাড়া তাঁর একটি সহপাঠী বন্ধু ছিল—যার নাম হেমন্ত। এই হেমন্ত তাঁর চিরকালের সাথী হয়ে উঠেছিল পরবর্তী যুগে। কলেজী জীবনে যেমন দিলীপ রায়।

একদিকে মা, অন্যদিকে বেণীবাবু আর সর্বদা বন্ধু হেমন্তের সাহচর্য, এই তিনের সমন্বয়ে তাঁর জীবনের ধারা এগিয়ে চললো স্বাভাবিক বিকাশের দিকে।

কিন্তু এ সবার পশ্চাতে আর একটি আদর্শ পুরুষ ধ্রুবতারকার মত স্থির ঔজ্বল্য নিয়ে আপাত প্রচ্ছন্ন থেকে তাঁকে পথ দেখাতে লাগলেন। তিনি শুধু পুরুষ নন, তিনি পুরুষসিংহ বিবেকানন্দ। এই একটি মানুষ যিনি ধর্ম ও দেশপ্রেমকে এক অপূর্ব মিশ্রনের মধ্য দিয়ে এক বৃহত্তর পরিণতির দিকে জাগ্রত করে তুলেছিলেন। এই লোকটিকে প্রথম থেকেই অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করতে শিখেছিলেন সুভাষচন্দ্র। প্রথমে তাঁর প্রভাব প্রচ্ছন্ন হয়ে কাজ করতো, তারপর তিনি যখন ম্যাট্রিক পাশ করে ১৯১৩ সালে কোলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে এসে ভর্তি হলেন তখন থেকেই তিনি ভালভাবে বিবেকানন্দকে এবং রামকৃষ্ণপরমহংসকে জানতে সুরু করলেন। ফলে, তাঁর মনের মধ্যে অদ্ভুত রকমের এক পরিবর্তন এল। মুক্তির পিপাসা জাগলো। এই বস্তুতান্ত্রিক জড়-জীবন থেকে এক মহত্তর সত্যের আস্বাদ পাবার জন্য তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। এবং শেষে ১৯১৪ সালে শীতের সময় তিনি সমস্ত সম্পদ, সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে হিমালয়ের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন বাড়ী ছেড়ে। কত ঋষি, সাধক হিমালয়ের দুর্গমে তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন, সত্য উপলব্ধি করেছেন, তাই তিনিও সঙ্কল্প করলেন হিমালয়ের নির্জনতার মধ্যে সাধনা করতে হবে। তাছাড়া সেখান থেকেই কোন সাধককে বেছে নিয়ে গুরু করতে হবে। গুরু না হলে ত' সাধনা সম্ভব নয়।

এমনি করেই ভারতের ইতিহাসে আর এক বালক বুদ্ধ সমস্ত ঐশ্বর্যকে হেলায় ত্যাগ করে সেই একমাত্র সত্যকে অর্জন করবার জন্যে যাত্রা করলেন। সুভাষচন্দ্রের বয়স তখন ষোল বছর মাত্র।

ভারতের আধুনিক রাজনৈতিক জগতের কোন জননায়কের জীবনে এমনটি দেখা যায়? এত অল্প বয়সে এতবড় আকাঙ্ক্ষার ক্ষুধা—এতবড় সাধনার দুর্দমনীয় বল?

কিন্তু, ব্যর্থ হতে হল। অনেক ঘুরলেন তিনি। পাহাড়ে-পবতে বনে-জঙ্গলে, রাত্রির পর রাত্রি একা একা ঘুরলেন শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে, দিনের পর দিন

কাটালেন সামান্য ফলমূল খেয়ে, তারপর ঘুরলেন তীর্থে তীর্থে,—গয়া, বৃন্দাবন, কাশী—কিন্তু কোথাও তাঁর মনের মানুষের সন্ধান পেলেন না। দেখলেন ধর্মগুরুর নামে কতগুলো লোক চারিদিক থেকে অন্যের ধন লুটে খাচ্ছে—কিছু দেবার মত সম্বল ও সাহস কোনটাই তাদের নেই। সাধারণ মানুষ যাদের দুয়ার কাছে বিভ্রান্ত মন নিয়ে হাত পাতে, তারা সাধারণ মানুষের চেয়ে মনের সম্পদে মোটেই উঁচু নয়। যে জড়-জীবনকে ত্যাগ করতে তিনি চেয়েছিলেন তার মধ্যে তারা আরও বিজড়িত হয়ে ডুবে আছে। তাই দু'মাস পর তিনি ফিরে এলেন।

যে সুভাষের ওপর তাঁর মা-বাবা অনেক কিছু আশা করেছিলেন, আশা করেছিলেন তাঁর অন্যান্য ভাইদের মত সুভাষচন্দ্রও একদিন বিদ্যায়, অর্থে যশস্বী হয়ে উঠবেন, মস্ত বড় সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হয়ে নিজের প্রতিষ্ঠা অর্জন করে নেবেন—সেই সুভাষ যখন বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়লেন বাড়ী ছেড়ে তখন তাঁর মা-বাবার মন যেন ব্যর্থতায় ভেঙ্গে গেল। এমনটি ত' তাঁরা প্রত্যাশা করেননি তাঁর কাছে থেকে।

একদিন তাঁরা বাড়ীর সকলে ড্রয়িং-রুমে বসে আলাপ করছেন এমন সময়ে হঠাৎ তাঁদের মাঝখানে এসে হাজির হলেন সুভাষচন্দ্র। বহু ঝড়-তুফান জয় করে তরী এসে পাড়ে ভিড়লো। উৎসাহে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলেন সকলে। শোনা যায় সুভাষচন্দ্র যখন মাকে প্রণাম করলেন তখন তিনি তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, তুই আমায় মারবি সুভাষ!

আত্ম-মুক্তির সন্ধানে বনজঙ্গল ঘুরে তিনি একদিন ফিরে এসেছিলেন মায়ের কোলে। কিন্তু সমস্ত ভারতবাসীর মুক্তির সন্ধানে তিনি যে মহাপ্রস্থান করেছেন —সেই মহাপ্রস্থানের পরে আবার তিনি যবে ফিরবেন সেদিন আর তাঁর স্নেহময়ী জননীর কোল তিনি পাবেন না। সেই কোল পাতবেন দেশজননী তার সোণার মাটির অঙ্গে অঙ্গে! সে-দিন আর কতদূর? মুগ্ধ বাঙ্গালী তার দিন গুনছে!

এতখানি অত্যাচার তাঁর শরীরে সইলো না। তাই ফিরে এসে কিছুদিন তিনি টাইফয়েডে ভুগলেন। সেরে উঠতে বেশ কিছুদিন লাগলো। তাই ১৯১৫ সালে সাধারণভাবে প্রথম বিভাগে তিনি এফ. এ. পাশ করলেন, প্রেসিডেন্সী থেকে।

কিন্তু বি. এ. পড়বার সময় দুর্যোগ দেখা দিল। এ বাধা এল আর এক দিক থেকে। জীবনের গোড়া থেকে তিনি দু'দিক দিয়ে নিজেকে গড়ে তুলছিলেন। এক ধর্মের দিক, আর অপরটা হল দেশপ্রেম। ধর্মের দিক থেকে এক অধ্যায় হয়ে গেল এফ. এ. পড়বার সময়। দেশপ্রেমের দিক থেকে প্রথম আত্মঘোষণা দেখা গেল এইবার।

সেই সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে ওটেন নামে একজন ইউরোপীয় অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপনার ক্ষেত্রেও যারা শাসক ও শাসিতের প্রভেদ ভুলতে পারে না তাদের নীচতা সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র প্রথম সজাগ হয়ে উঠলেন এই ওটেনের ব্যবহারে। ওটেন সাহেব কি একটা কারণে একদিন শুধু গালাগাল নয়, একটি ছাত্রকে চড় মেরে বসলেন। ভাবটা তাঁর এই যে, যারা পরাধীন তাদের আবার আত্মসম্মান কি, তারা ত' চড় খাবেই। রুদ্ধ অপমানে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো ছাত্রের দল। কিন্তু এদের মধ্যেই ছিল একজন যে অদূর ভবিষ্যতে শুধু প্রতিবাদের দৃপ্ত-কণ্ঠে নয়, রীতিমত কামানের বজ্রনিনাদে সমস্ত অবিচার আর জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করবে—বুকের রক্তের বন্যা দিয়ে ধ্বসিয়ে দেবে অন্যায়ের স্তূপ! বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন সুভাষচন্দ্র। জাতির আত্মসম্মানের মূল্য তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশী। সেই আত্মসম্মানকে পদদলিত করতে তিনি দিতে পারেন না। এই ক্ষুদ্র ঘটনা শুধু ব্যক্তিগত অপমান নয়, এ সমস্ত ছাত্রজাতির—সমস্ত ভারতবাসীর হতচেতন আত্মার সম্মান। এই অসম্মানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে।

সকলে সাড়া দিলে এই আন্দোলনে। সুভাষের নেতৃত্বে সকলে গোপনে এসে জড় হল। ধর্মঘট চললো। এবং শেষে কলেজ কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে ছাত্রদের

সঙ্গে মিটমাটের একটা ব্যবস্থা করলেন। ছাত্রদের স্বপক্ষেই তা হল। কিছুদিনের মত এই অধ্যাপকটি সাবধান হয়ে রইলেন। কিন্তু স্বভাব অত সহজে বদলায় না মানুষের। আর একদিন তিনি সেই পূর্ব ঘটনার পুনরভিনয় করে বসলেন। ফলে ছাত্ররা ওটেনকে ধরে বেশ করে প্রহার করলে। এবং সুভাষচন্দ্র এই বিদ্রোহের নেতা হিসেবে দু'বছরের জন্যে বহিষ্কৃত হলেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তাঁর সঙ্গে আরও দু'জন ছাত্রের ওপর এই দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হল।

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ছাত্র সম্মেলনের সভাপতিত্ব করবার সময় এই ঘটনার উল্লেখ করে সুভাষচন্দ্র বলেন—প্রিন্সিপাল আমাকে বলেছিলেন, তুমি কলেজের যত নষ্টের গোড়া। আমার জীবনে সে এক স্মরণীয় দিন। সেই প্রথম আমি একটা মহৎ কাজের জন্য লাঞ্ছনা ভোগের আনন্দ উপভোগ করি। এই আনন্দের কাছে অন্য আনন্দ নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

সামান্য দু'বছর বহিষ্কার দণ্ড। সামান্য এই বীজ থেকে ফলেফুলে সমৃদ্ধ কতবড় মহীরুহ জন্ম নেবে পরবর্তীকালে, তার সুপ্ত সম্ভাবনা ঘুমিয়েছিল এর মধ্যে। তারপর আরও বিস্তৃত পরিধি—শুধু সীমাবদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নয়—ভারতের সীমানারও বাইরে বছরের পর বছর নির্বাসন!

১৯১৭ সালে স্যর আশুতোষের মধ্যস্থতায় তিনি আবার বি. এ. পড়বার জন্যে ভর্তি হলেন স্কটিশচার্চ কলেজে। সেখানে অবশ্য নির্বিরোধেই তাঁর পড়াশোনা চলেছিল। এবং ১৯১৯ সালে যথারীতি তিনি প্রথম শ্রেণীর অনার্স নিয়ে দর্শন-শাস্ত্রে বি. এ. পাশ করলেন। প্রথম শ্রেণীতে তিনি দ্বিতীয় হয়েছিলেন। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় বাহিনীর উৎপত্তি হয়। তিনি এই বাহিনীতে যোগ দিয়ে স্বভাবসুলভ দক্ষতা দেখিয়েছিলেন।

বাঙ্গলায় অগ্নিযুগ তখন সবেমাত্র শেষ হয়েছে। সবেমাত্র ঠিক বলা যায় না, তবুও সেই যুগ যে ইন্ধন জুগিয়েছিল—যে-ভাবে জাগিয়ে তুলেছিল সমস্ত দেশকে তারই রেশ নিয়ে সমস্ত দেশব্যাপী আন্দোলন আর বিক্ষোভ চলেছে শাসকের

অত্যাচারের বিরুদ্ধে। অসহায় নিরস্ত্র নরনারীর ওপর সশস্ত্র অত্যাচার চলেছে বৃটিশ শাসনের চরম কলঙ্ক রক্তের কর্দমে পঙ্কিল হয়ে উঠলো জালিওয়ান-ওয়ালাবাগের পটভূমিতে। এর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে খিলাফৎ আন্দোলন। মহাযুদ্ধের কত শত ত্যাগ ও আত্মবলিদানের বিনিময়ে ভারত পেয়েছে রাওলাট বিল। বিভ্রান্ত মানুষ চিনতে শিখেছে ইংরাজ শাসকের স্বরূপকে। দেশের সমস্ত নেতা প্রায় কারারুদ্ধ। মুক্তির আহ্বানে জোয়ার জেগেছে সমস্ত যুবকের রক্তে। সেই অসম্ভব উন্মাদনার যুগে বিপ্লবী সুভাষের মনে যে জাগরণের ঢেউ উঠবে সেটা আন্দাজ করতে একটুও দেরী হয়নি তাঁর অভিভাবকদের মনে। এবং এই জাগরণের পরিণাম ও বিস্তার যে কত সুদূর প্রসারী সেটাও তাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন। তাই তাঁরা সকলে মিলে সাব্যস্ত করলেন সুভাষকে এমন একটা পড়ায় ডুবিয়ে রাখতে হবে যাতে তিনি অন্য কোনদিকে মাথাঘামাবার অবসর না পান। শেষটা ঠিক হল বিলাতে পাঠিয়ে আই. সি. এস. পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করাই ভাল। আই. সি. এস. প্রায় কঠিনতম পরীক্ষা। তার ওপর বিলাতের আবহাওয়ার মধ্যে পড়লে, সেখানকার অবাধ স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসের পরিবেশের আস্বাদ পেলে আপনা থেকেই সুভাষের মন থেকে এই সব বিপ্লবের স্বপ্ন বিদায় নেবে, মিলিয়ে যাবে। তাঁদের এ ধরণের ধারণাটা নেহাৎ অসঙ্গত নয়। কারণ পাশ্চাত্য জীবনের বাহ্যিক আড়ম্বরের মধ্যে বহু লোকের জীবনে এরকম পরিবর্তন এসে থাকে। সেই ঐশ্বর্যের জৌলুসের এমনই একটা আকর্ষণী ক্ষমতা আছে।

কিন্তু, সুভাষচন্দ্র তাঁর সতর্ক বিবেক দিয়ে এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারলেন না। এই বিলাস ও স্বাচ্ছন্দ্যের সামান্যতম আকর্ষণের ইঙ্গিত আসবার বহু আগে তাঁর ডাক এসে গেছে আর একদিক থেকে—অনাড়ম্বর অন্তরের ধ্রুব দিক সে।

তিনি জানতেন আই. সি. এস পাশ করে হাকিমের চাকরী নিয়ে প্রচুর অর্থ

উপার্জনের লোভে নিজেকে বিদেশীর হাতে বিকিয়ে দেওয়া তাঁর কাজ নয়। সে-পথ তাঁর জন্যে নয়। সে-পথে পা বাড়ালে তাঁর নিজের পথ থেকে বহুদূরে সরে দাঁড়াতে হবে, তখন হয়ত ফিরে আসবার সুযোগ আর থাকবে না। তাছাড়া এই দেশব্যাপী আন্দোলনের মাঝখানে তাঁর প্রয়োজন আছে, তাঁর স্থান আছে, শুধু স্থান নয়, তিনি বিশ্বাস করতেন বিশিষ্ট স্থান আছে।

কিন্তু তবু তাঁকে যেতে হল। অভিভাবকদের পরামর্শ তিনি এড়াতে পারলেন না। বন্ধুবর হেমন্ত বললে যে এই একটা বড় সুযোগ। এই সুযোগে তিনি জগতকে দেখে আসতে পারেন—স্বাধীন জগতের আসল পরিচয়…! ..

বিলেতে গিয়েও তিনি তাঁর মনের দ্বন্দ্বকে জয় করতে পারেন নি। তিনি লিখতেন যে তিনি জোর করে মনকে রাজী করালেও অন্তর থেকে সায় দিতে পারেন নি।

একদিকে পড়ে রইলো নিজের দেশ…আদর্শের জন্মভূমি…কর্মক্ষেত্র আর অন্যদিকে স্বাধীন দেশের মুক্ত হাওয়া…মুক্ত জীবন। একদিকে দারিদ্র্য-পীড়িত …দুর্ভিক্ষ বিধ্বস্ত…ভগ্নস্বাস্থ্য নরনারীর দল অন্যদিকে আনন্দ ও জীবনের তরঙ্গে অবাধ ভেসে-যাওয়া পূর্ণস্বাস্থ্য মানুষের দল…!…একদিকে নিপীড়িত নির্যাতীত হৃতসর্বস্ব মানুষের কঙ্কাল আর অন্যদিকে শাসক-শ্রেণীর অপহৃত ধনে ভোগের বিচিত্র সমাবেশ !…

এক নতুন দৃষ্টি দিয়ে চিনতে শিখলেন সুভাষ নিজের দেশকে। সে দৃষ্টি বুঝি অস্বচ্ছ হয়ে গেল চোখের জলে !

এই সময় থেকেই তাঁর মনে নানারকম সঙ্কল্পের উদয় হতে থাকে। তিনি ভাবতে আরম্ভ করেন তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার কথা। এবং বিলেতে যে আবহাওয়ার আকর্ষণে তাঁর মন শান্ত হয়ে যাওয়ার কল্পনা তাঁর অভিভাবকেরা করেছিলেন সেই আবহাওয়ার মধ্যে পড়েই তাঁর মনে বিদ্রোহের আগুন দ্বিগুণভাবে জলে উঠলো।

এই সময় তাঁর ইংরাজবিদ্বেষ এমন বেড়ে গিয়েছিল যে তিনি লিখেছিলেন, 'যখন দেখি শ্বেতাঙ্গ লোকেরা আমার জুতো বুরুশ করছে তখন আমার সবচেয়ে বেশী আনন্দ হয়।'

এই সময়ে লণ্ডনে শ্রীমতী রায় ও শ্রীমতী নাইডু খুব সুন্দর সব বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। সুভাষচন্দ্র এই সব বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়ে লিখেছিলেন, এ-সব শুনে মনে হয় যে-দেশে এই সব মহিলার জন্ম হতে পারে সে-দেশের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল না হয়ে পারে না।

লণ্ডনে থাকবার সময়ে তিনি খুব সংযতভাবে এবং যথাসম্ভব স্বল্পব্যয়ে থাকতেন। কিন্তু তাঁর সাজসজ্জায় ও চালচলনে এতটুকুও কেতাদুরস্ততার অভাব দেখা যেত না। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে মাত্র নয় মাসের মধ্যেই তিনি আই. সি. এস. পরীক্ষায় খুব কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে চতুর্থ স্থান অধিকার করলেন এবং ইংরাজীতে প্রথম হলেন। ইতিমধ্যে কেম্ব্রিজ থেকে নীতি বিজ্ঞানে ট্রাইপোজ উপাধি লাভ করেছিলেন। এই দু'টো সম্মানই যে কোন ভারতীয়ের পক্ষে গৌরবের বিষয়। কিন্তু তিনি নিজে আই. সি এস পরীক্ষার এই কৃতকার্যতায় হতাশ হয়ে পড়লেন। তিনি লিখলেন, আমার দুর্ভাগ্য যে আমি এতে পাশ করেছি। সত্যি সত্যিই তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল যে শেষে বাধ্য হয়েই তাঁকে চাকরী নিতে হবে। তাই চাকরী পাওয়ার পর তিনি অনেক চেষ্টায় পদত্যাগ পত্র দাখিল করে সেটা মঞ্জুর করিয়ে নিলেন। তিনি লিখেছিলেন, একই সঙ্গে দু'জন মনিবের সেবা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দু'জন মনিব অর্থে—এক : ইংরাজ সরকার আর দুই : আমার দেশ।

ভোগের উপচারকে ত্যাগ করে তিনি বরণ করে নিলেন আত্মত্যাগের ব্রত।

দেরী করবার সময় নেই। তাই যেদিন জাহাজ এসে ভিড়লো বোম্বাই বন্দরে সেইদিনই বিকেলে (১৬ই জুলাই ১৯২১) সুভাষচন্দ্র দেখা করলেন মহাত্মা গান্ধীর

সঙ্গে! বোম্বাই সহরে মণিভবনে গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষের এক ঘণ্টারও বেশী সময় আলোচনা চললো তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে। অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করবার, অনেক কিছু বোঝবার ছিল তাঁর। গান্ধীজী তখন ভারতের একছত্র নেতা। তাঁর আবির্ভাবে নতুন এক দ্বার খুলে গেছে স্বাধীনতার যুদ্ধের। নতুন পথ। সুভাষচন্দ্রের সেই পথ সম্বন্ধে অনেক কিছু পরিষ্কার করে বোঝবার ছিল। কিন্তু অনেক আশা নিয়ে এলেও কথাবার্তার পর 'তিনি যখন বেরিয়ে এলেন গান্ধীজীর কাছ থেকে, তখন দেখা গেল তিনি হতাশ হয়েছেন। গান্ধীজীর উত্তরে তাঁর মন আশ্বস্ত হয় নি একেবারে।

সুভাষচন্দ্র ফিরে এলেন কোলকাতায়। ফিরে এসে দেখা করলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তখন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা, শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক বীর। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের একমাত্র জ্বলন্ত প্রতীক। বাংলার মুকুটহীন সম্রাট! তাই সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর কাছে হতাশ হয়ে দেখা করতে এলেন দেশবন্ধুর সঙ্গে। তরঙ্গমুখর নদী মোহনার মুখে এসে সাগরের সম্মুখে হাত পেতে দাঁড়ালো! চির যুবক দেশবন্ধু এই বিপ্লবী যুবকের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

এই মিলনের প্রয়োজন ছিল। কারণ গান্ধীজীর মতের সঙ্গে যখন সুভাষের মিল হল না তখন একমাত্র দেশবন্ধু ছাড়া আর এমন কোন লোক তখন ছিলেন না যিনি সুভাষের মত বীরকে চালনা করতে পারেন। অবশ্য গান্ধীজীর মতবাদ তখন সারা ভারতবর্ষে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে কিন্তু বাঙ্গলাদেশে দেশবন্ধুর আদর্শই একমাত্র আদর্শ। তাছাড়া সুভাষচন্দ্র নিজে বলেছেন যে গান্ধীজীর কথা-বার্তা তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। তাঁর মনে হয়েছে গান্ধীজীর কর্মপন্থা যথেষ্ট নির্দিষ্ট নয়। তার মধ্যে অনেক অস্পষ্টতা আছে এবং যার ফলে সেই পথে ভারত তার লক্ষ্যস্থলে পৌছতে পারবে না।

কিন্তু দেশবন্ধুর আদর্শে তিনি সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁর মন অন্তর

থেকে সাড়া দিয়ে উঠলো। সেইদিন থেকে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর একনিষ্ঠ অনুগামী। জীবনে একমাত্র দেশবন্ধু ছাড়া আর কারও নেতৃত্ব এমনভাবে তাঁকে বরণ করে নিতে দেখা যায় নি।

সুভাষবাবু যখন রীতিমত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নামলেন, তখন দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন সুরু হয়ে গেছে। গান্ধীজীর ডাকে সমস্ত দেশ সাড়া দিয়ে উঠেছে। অনেক ডাক্তার, আইন ব্যবসায়ী তাদের ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছেন। যে সব ছাত্রেরা বিতাড়িত হচ্ছে কলেজ থেকে তাদের নিয়ে অনেকগুলো প্রদেশে জাতীয় কলেজ স্থাপনা করা হয়েছে। বাঙ্গলাদেশে জাতীয় কলেজের ভার ছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ওপর। চিত্তরঞ্জন দেখলেন সুভাষচন্দ্রের ওপর এই ভার দেওয়া গেলে খুব ভাল কাজ হবে। কারণ সুভাষচন্দ্র বিলেতে থাকবার সময় ওখানকার দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে খুব বেশীরকম জানবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি জানতেন দেশে ফিরে গিয়ে তাকে কাজে নামতে হবে এবং কাজে নামতে হলে প্রথমেই দেশের যুবকদের আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত করে তোলা দরকার। তাই ওখানে নিজের ব্যক্তিগত পডাশোনার চেয়ে তিনি জোর দিয়েছিলেন জাতিগঠনের মালমশলা সংগ্রহের দিকে। জাতীয় কলেজের ভার হাতে পেয়ে সুভাষবাবু খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। তিনি তাঁর নিজের কর্ম্মপন্থা অনুযায়ী দেশের যুবকদের গডে তুলতে লাগলেন। আর সবার পেছনে দেশবন্ধু নিজে সকল বিষয়ে তাঁর বিরাট অভিজ্ঞতা ও বিবেচনা শক্তির সাহায্যে প্রেরণা দিয়ে চললেন সুভাষবাবুকে। এই কলেজে শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয় ছাত্রেরা আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম ও চরিত্রনিষ্ঠার শিক্ষা পেতে আরম্ভ করলে। তাই সাধারণ কলেজ থেকে এই জাতীয় কলেজের ছাত্রেরা অনেক বিষয়ে উন্নততর হয়ে উঠতে লাগলো।

যুবকদের নিয়ে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা হল। এই বাহিনীর পুরোভাগে রইলেন সুভাষচন্দ্র নিজে। সরকার পক্ষ এতদিন চুপ করে দেখছিলেন

সুভাষচন্দ্রের কাজ কতখানি সম্ভব হতে পারে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সুভাষবাবুর দল যখন সংখ্যায় অত্যন্ত বেশী বেড়ে উঠতে লাগলো এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে তারা অদ্ভুত রকমের শিক্ষিত হয়ে উঠতে লাগলো তখন কর্তৃপক্ষ বুঝলেন এখনই এই বাহিনী ভেঙ্গে দেওয়া দরকার। এবং তার সুযোগও এসে গেল।

এই সময় কথা হল রাজপুত্র প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ ভারত পরিভ্রমণে আসছেন। সরকার থেকে হুকুম দেওয়া হল তার জন্যে সমস্ত দেশ সজ্জিত করা হবে। কিন্তু মহাত্মাজী আদেশ দিলেন প্রিন্স অব ওয়েলসের আগমনে ভারতবাসীর পক্ষে আনন্দ জয়ধ্বনি করার কিছুই নাই। যে ইংরাজ মহাযুদ্ধে ভারতের অসামান্য ত্যাগের মর্যাদা দেয় নি সেই ইংরাজ—সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর আগমনে সর্বদেশব্যাপী হরতাল পালন করতে হবে। সরকার পক্ষ বললেন যে, রাজপুত্র আসছেন ভারতকে তার অসামান্য ত্যাগের জন্য ধন্যবাদ জানাতে। কিন্তু এ প্রবঞ্চনায় দেশবাসী বিভ্রান্ত হল না। প্রিন্স অব ওয়েলস যেদিন এসে নামলেন বোম্বাই বন্দরে সেদিন চতুর্দিকে হরতাল পালিত হল।

২৫শে ডিসেম্বর প্রিন্স অব ওয়েলসের কোলকাতা আসবার কথা। কোলকাতাও বোম্বাই সহরের পুনরভিনয়ের জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল। তাই সরকার তাড়াতাড়ি জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে বেআইনী বলে ঘোষণা করে দিলেন। এই আদেশের বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও খিলাফৎ দল প্রতিবাদ জানালো। ফলে বহু কংগ্রেস নেতা, দেশবন্ধু স্বয়ং, তাঁর পুত্র, স্ত্রী, মৌলনা আবুল কালাম আজাদ ও সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হলেন। এবং তাদের বিভিন্ন পর্যায়ে কারাদণ্ড হল। শোনা যায় দেশবন্ধু গ্রেপ্তার হবার সময় বলেছিলেন, আমায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাতে কি হয়েছে? সমস্ত দেশ আজ কারারুদ্ধ! তার মুক্তি সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

তাই হল বাস্তব ক্ষেত্রে। যেদিন প্রিন্স অব ওয়েলস এসে পৌছলেন কোলকাতায় সেদিন সহর শুদ্ধ হরতাল। পথ ঘাট লোকশূন্য। পতাকা উড়ছে

বটে সৌধে সৌধে কিন্তু সে পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক নয়—সে পতাকা কৃষ্ণবর্ণের! এমনি করেই বাঙ্গলা দেশ অভ্যর্থনা জানালো তাদের ভবিষ্যৎ অধীশ্বরকে।

ছয়মাস কারাদণ্ড হল সুভাষ বাবুর। এই প্রথম তাঁর কারাবাস! তিনি আশা করেছিলেন ছয়মাসের বেশী কারাদণ্ড হয়ত তাঁকে ভোগ করতে হবে। কিন্তু কার্যত তা হয়নি দেখে তিনি বলেছিলেন, মাত্র ছ'মাস? আমি কি ছিঁচকে চোর নাকি?

ছয়মাস পুরো কারাবাসের পর ১৯২২ সালে সুভাষবাবু আবার কর্মক্ষেত্রে এসে নামলেন। অবশ্য এবারে তাঁর কর্মক্ষেত্র রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে গড়ে উঠলো না। এই সময়ে বাঙ্গলাদেশে বিরাট প্লাবনে বহু ঘরবাড়ী ভেসে গিয়েছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পরিচালনায় একটি সাহায্য সমিতি খুলে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে সুভাষ বাবু জনসেবায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এই সময় তাঁর এই অক্লান্ত সেবা দেখে সকলেই বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিল। লর্ড লিটন নিজে ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন এবং তাঁর কাজের সুখ্যাতি করেছিলেন।

এই রকম জনহিতকর কাজের দিকে বরাবরই তাঁর ঝোঁক দেখতে পাওয়া যায়। অনেক সময়ে দুর্ভিক্ষ বন্যা প্রভৃতি দুর্যোগে তাঁকে সেবা করতে দেখা গিয়েছে। শুধু তাই নয় জেলে (মান্দালয়ে বা অন্যত্র) থাকাকালীন বন্ধুদের সহিত পত্রালাপের মধ্যে তিনি বারবার সমাজ-সেবা ও দুঃস্থ-সেবার প্রতি জোর দিতেন। এবং এ বিষয়ে তিনি কতদূর যে আগ্রহশীল ছিলেন তা তাঁর চিঠিপত্রের ভাব ও ভাষার মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেত। শুধু সেবা নয়, তিনি চেয়েছিলেন প্রত্যেক দুঃস্থ নর-নারীকে স্বাবলম্বী করে তোলবার মত যথাসাধ্য কার্যকরী শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা। এই বিষয়ে জেলের মধ্য থেকেই সুন্দর সুন্দর পরিকল্পনা তিনি পাঠাতেন। এমন কি আজাদ হিন্দ ফৌজের ইতিহাস আলোচনার সময়েও আমরা দেখতে পাই যে, বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষের সময়ে তিনি এক লক্ষ টন চাল পাঠাবার চেষ্টা করেছিলেন।

এর পর ইতিহাসবিখ্যাত কংগ্রেসের গয়া অধিবেশন। এবং স্বরাজ পার্টির জন্ম। এই অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস। সাধারণ বাৎসরিক অধিবেশন হলেও এই গয়া কংগ্রেসের খুব বেশী রকম গুরত্ব ছিল। কারণ এই সভাতেই স্থির হয় যে কংগ্রেস ব্যবস্থাপক সভায় যোগদান করে সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করবে কিনা? চিত্তরঞ্জন জোর দিয়ে ঘোষণা করলেন যে ব্যবস্থাপক সভায় যোগ দিলে কংগ্রেস আরও সহজে তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবে, বয়কট করে শুধু অসহযোগ করে সে রকম ফল পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ দেখা গেল একদিকে গান্ধীর দল আর অন্যদিকে চিত্তরঞ্জন-সুভাষচন্দ্রের দল। এই ঘরোয়া বিবাদের ফলেই স্বরাজ পার্টির উৎপত্তি। চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে গঠিত এই দল স্থির করলে যে এইদল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবে। এবং এই দলের মুখপত্র স্বরূপ দেশবন্ধু নূতন একখানা ইংরাজী দৈনিকপত্র বের করলেন। সেই কাগজের নাম হল ফরওয়ার্ড এবং এই কাগজের ভার পড়লো সুভাষচন্দ্রের ওপর।

এখানে প্রশ্ন ওঠে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর বিরুদ্ধে এই স্বতন্ত্র দল গড়ে তুললেন কেন? তার উত্তরে বলা যায় যে বরাবরই তিনি গান্ধীজীর পন্থার ওপর আস্থা রাখতে পারেন নি। উপরন্তু এই অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার মূলে আছে গান্ধীজীর অস্বাভাবিক রকমের আত্মবিশ্বাস। তিনি হয়ত অন্যান্য নেতাদের মত নিলে ভাল করতেন। তবে একথা সুভাষবাবু বার বার স্বীকার করেছেন যে গান্ধীজীর দান অসামান্য। এবং কংগ্রেসের সমস্ত নেতা বা সাধারণ কর্ম্মী প্রত্যেকেই মাথা নত করে গান্ধীজীর বিরাট ব্যক্তিত্ব শ্রদ্ধাভরে স্বীকার করবে। তবে প্রয়োজনের তাগিদে এমন দিন এসেছে যখন এই স্বরাজ পার্টি গান্ধীজীকে রাজনৈতিক জীবন থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য করবে।

প্রকৃত পক্ষে হলও তাই। সমস্ত প্রদেশে স্বরাজ পার্টি প্রবল ও জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। এবং নির্বাচনে দেখা গেল কি কেন্দ্রীয় কি প্রাদেশিক

সকল সভাতেই স্বরাজ পার্টি বিপুল জয়লাভ করেছে। এই জয়লাভের মূলে ছিলেন দেশবন্ধু নিজে এবং সুভাষ পরিচালিত পত্রিকা ফরওয়ার্ড। বাস্তবিক সুভাষবাবুর সুদক্ষ পরিচালনার গুণে এই কাগজ অতি অল্প দিনের মধ্যেই জনসাধারণের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। স্বরাজ পার্টির জয় পরোক্ষে সুভাষচন্দ্রেরই জয়!

এরপর ১৯২৪ সালে স্বরাজ পার্টি প্রথম কোলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করলো। ফলে দেশবন্ধু মেয়র এবং সুভাষচন্দ্র প্রধান কর্মকর্তার পদলাভ করলেন। এবং কোলকাতা কর্পোরেশনের দেখাদেখি অন্যান্য বড় বড় সহরেও এইরকম নির্বাচন চললো এবং স্বরাজ পার্টি জয়লাভ করতে থাকলো।

সুভাষচন্দ্রের কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তার পদগ্রহণ একটি স্মরণীয় ঘটনা। এর আগে এই পদের বেতন ছিল মাসিক তিন হাজার টাকা। সুভাষবাবু সেটা গোড়াতেই কমিয়ে দেড হাজার করে নিলেন যাতে বাকী টাকাটা জনহিতকর কার্যে ব্যবহৃত হতে পারে। অবশ্য বাকী যে দেড় হাজার টাকা তিনি নিতেন সেই টাকার মধ্যে অধিকাংশই তিনি দান করে ফেলতেন। নিজের জন্যে প্রায় কিছুই থাকতো না বলতে গেলে। যাই হোক তিনি এবং দেশবন্ধু দু'জনে কর্পোরেশনের কর্মব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে ফেললেন। মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গদের হাত থেকে জনসাধারণের কর্পোরেশন জনসাধারণের হাতের মধ্যে এনে ফেললেন। সেদিন থেকেই ইংরাজ বুঝতে শেখে সুভাষচন্দ্রের শক্তি কতখানি। সুভাষবাবুর আদেশেই কর্পোরেশনের জনহিতকর কাজের পরিধি বেড়ে গেল। দরিদ্রদের জন্য অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, ডাক্তার খানা, দুগ্ধ-কেন্দ্র প্রভৃতি খোলা হতে লাগলো। কোলকাতার রাস্তাঘাট পার্ক প্রভৃতির নামকরণ হতে থাকলো দেশের নেতাদের নামে। বড় বড় নেতাদের সহরবাসীদের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনার ব্যবস্থা হতে লাগলো। সব চেয়ে আনন্দের বিষয় এই যে কর্পোরেশনের অফিসের সাজপোষাক সমস্ত খদ্দরের হবে বলে স্থির করা হল। কর্পোরেশনের

ইতিহাসে সে এক অভাবনীয় অধ্যায়। এই সব আশঙ্কা করেই বাঙ্গলা সরকার প্রথমে সুভাষবাবুকে এই পদে নিযুক্ত করতে চান নি। কিন্তু পরে জনসাধারণের ইচ্ছার চাপে করতে বাধ্য হ'ন। যাই হোক সুভাষবাবু অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন।

কিন্তু বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য যে বেশীদিন তারা সুভাষবাবুকে তাদের মধ্যে আর পেলে না। সুভাষবাবু সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়লেন। পড়া স্বাভাবিক কেন না দেশের এই সর্ববিধ উন্নতির চেষ্টা সহ্য করা আমাদের ইংরাজ শাসকদের ধর্ম নয়। তাই ২৫শে অক্টোবর ১৯২৪ ভোরবেলা অতর্কিতে পুলিশে সুভাষবাবুর বাড়ী ঘেরাও করলে। এবং তিনি স্পেশ্যাল অর্ডিনান্সের বলে গ্রেপ্তার হলেন।

দেশময় তুমুল আন্দোলন চললো। দেশবন্ধু কর্পোরেশনের তরফ থেকে প্রতিবাদ জানাতে লাগলেন। তিনি ঘোষণা করলেন বিনা বিচারে এমনিভাবে আটক রাখা সম্পুর্ণ বেআইনী। দেশশুদ্ধ লোক তাঁকে সমর্থন করতে লাগলো বিক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে। এদিকে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান আর ইংলিশম্যান এই দুখানা শ্বেতাঙ্গ-মুখপত্র সুভাষবাবুর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহী হিসেবে লেখালিখি সুরু করলে। তার ফলে জনসাধারণ আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। কংগ্রেসের তরফ থেকে এই বিষয়ে ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনা হল। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসের শরনাপন্ন হল। ফলে কোনও রকম প্রতিকার হল না। এদিকে আন্দোলন উত্তরোত্তর বাড়তে লাগলো। এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন বাঙ্গলা সরকার রাত্রের অন্ধকারের মধ্যে এ্যাসিসট্যাণ্ট ইন্‌স্‌পেক্‌টর জেনারল অব পুলিশ মিষ্টার লোম্যানের অধীনে একদল বন্দুকধারী পুলিশের পাহারায় সুভাষবাবুকে আরও সাত জন বন্দীর সঙ্গে মান্দালয় জেলে চালান করে দিলেন।

শোনা যায় এই খবর শুনে সুভাষবাবুর বাবা বলেছিলেন—আমরা সুভাষের জন্যে গর্ব অনুভব করি।

মান্দালয়! বৃটিশ বর্বরতার শেষ পরিচয়। যার অন্ধকার কুঠুরীর মধ্যে কত মহাপ্রাণ তিলে তিলে জীবনের শেষ সম্বলটুকু ক্ষয় করে এসেছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পুরস্কার স্বরূপ! এই সেই মান্দালয় যেখানে লোকমান্য তিলকের মত লোককে বছরের পর বছর মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে হয়েছিল। সুভাষবাবু নিজে লিখেছেন—'কিন্তু, এ বিষয়েও আমার নিশ্চিত ধারণা যে মান্দালয় জেলে ছ'বছর বন্দী হয়ে থাকাটাই তাঁর অকাল-মৃত্যুর কারণ।' তবু অন্য স্থানে সুভাষবাবু বলেছিলেন, 'আমার স্পষ্ট মনে পড়ে যে এ সেই স্থান যেখানে তিলককে ছ'বছর কাটাতে হয়েছিল আর লাজপত রায়কে এক বছর। এই ভেবেই আমরা সান্তনা পেয়েছিলাম যে যাই হোক আমরা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চলেছি, সে বিষয়ে আমরা গর্ব করতে পারি।'

ছাত্রবয়সে তাঁর বিদ্রোহী মনকে শান্ত করবার জন্যে তাঁর অভিভাবকেরা তাঁকে বিলাত পাঠাতে চেয়েছিলেন। এবং পরে প্রমাণিত হল সে দিক দিয়ে তাঁদের ভুল হয়েছে। তবে তার থেকেও বড় ভুল করলেন ভারত সরকার তাঁকে মান্দালয়ে নির্বাসন দিয়ে। সুভাষবাবু এতদিন একনিষ্ঠ সেবকের মত দেশবন্ধুকে অনুসরণ করে আসছিলেন। তিনি যে দিক থেকে দেশের মুক্তির সম্ভাবনা চিন্তা করেছিলেন দেশবন্ধুর আদর্শ ছিল তদ্রূপ। তাই দেশবন্ধুর স্বরাজ পার্টিতে কাজ করবার সময় সুভাষচন্দ্র স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন কর্মপন্থার পরিকল্পনা করবার মত যথেষ্ট অবসর পান নি। কিন্তু মান্দালয় জেলের নির্জনতা তাঁকে সেই সুযোগ এনে দিল। তিনি নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করলেন।

প্রথমে জেলে গিয়ে জেলের মধ্যেই তিনি এক আন্দোলন সুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন জেলের মধ্যে দুর্গা পূজা করবেন। দুর্গা-পূজা বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ ধর্মানুষ্ঠান কাজেই সরকারের বাধা দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। কিন্তু তবু তাঁরা যখন অনুমতি পেলেন না তখন তাঁরা অনশন ব্রত সুরু করলেন। এই অনশনের সংবাদ দেশের মধ্যে কি ভাবে যেন ছড়িয়ে

পড়েছিল। তাই নিয়ে আবার দেশজোড়া আন্দোলন চললো। এদিকে দেশের জনসাধারণ ব্যাবস্থাপক সভার নির্বাচনে সুভাষবাবুকে মনোনীত করে বসলো। তখন বাধ্য হয়ে সরকার পক্ষ অনশন ব্রতীদের সঙ্গে একটা সম্মানজনক রফা করলেন।

এর পর থেকে সুভাষবাবুর মনে ধীরে ধীরে একটা পরিবর্তন আসতে শুরু হয়। তিনি আরও গভীর ভাবে নিজেকে দেশের সঙ্গে সংযুক্ত রেখে চিন্তা করতে আরম্ভ করেন। যদিও জেলের অনাচার অত্যাচারের মধ্যে তাঁর শরীর ভেঙ্গে আসছিল তবু তাঁর মনের বল যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সময়ে তাঁর লেখা কয়েকটা চিঠির কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি। তাহলে তাঁর এই মনের পরিবর্তন ঠিকমত অনুধাবন করা যাবে।

'আজ চৌদ্দমাস আমি জেলে। এর মধ্যে এগারো মাস কাটলো সুদূর ব্রহ্মদেশে। সময়ে সময়ে মনে হয় যে, দীর্ঘ চৌদ্দমাস দেখতে দেখতে গেল, কিন্তু অন্য সময়ে মনে হয় যেন কত যুগ ধরে এখানে রয়েছি। এ যেন আমার ঘরবাড়ী; কারাগারের বাহিরের কথা যেন স্বপ্নের মত, প্রহেলিকার মত বোধ হয়; যেন ইহজগতে একমাত্র সত্য হচ্ছে লৌহের গারদ ও প্রস্তরের প্রাচীর! বাস্তবিক এ একটা নূতন বিচিত্র রাজ্য। আবার সময়ে সময়ে মনে হয়, যে জেলখানা দেখে নাই সে জগতের কিছুই দেখে নাই। তার কাছে জগতের অনেক সত্য প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই। আমি নিজের মনকে বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে, এইরকম চিন্তা ঈর্ষা প্রসূত নয়। আমি প্রকৃতপক্ষে জেলখানায় এসে অনেক শিখেছি; অনেক সত্য যাহা একসময় ছায়ার মত ছিল, এখন আমার নিকট সুস্পষ্ট হয়েছে, অনেক নূতন অনুভূতিও আমার জীবনকে সবল ও গভীর করে তুলেছে। যদি ভগবান কোনও দিন সুযোগ দেন ও মুখে ভাষা দেন—তবে সে সব কথা দেশবাসীকে জানাবার আকাঙ্ক্ষা ও স্পর্ধা আছে।

'জেলে আছি—তাতে দুঃখ নেই। মায়ের জন্য দুঃখভোগ করা সে ত, গৌরবের

কথা! Suffering-এর মধ্যে আনন্দ আছে, একথা বিশ্বাস করুন। তা না হলে লোক পাগল হয়ে যেত, তা না হলে কষ্টের মধ্যে লোক হৃদয়ের আনন্দে ভরপুর হয়ে হাসে কি করে? যে বস্তুটা বাহির থেকে Suffering বলে বোধ হয়—তার ভিতর থেকে দেখলে আনন্দ বলেই বোধ হয়।

'আমার শুধু দুঃখ এই যে, চৌদ্দমাস কাল অনেকটা হেলায় কাটিয়েছি। হয়ত বাঙ্গলার জেলে থাকলে এই সময়ের মধ্যে সাধনার পথে অনেকটা এগুতে পারতুম। কিন্তু তা হবার নয়! এখন আমার প্রার্থনা শুধু এই, 'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি। যখনই খালাসের কল্পনা করি তখন আনন্দ যত হয়, তার চেবে বেশী ভয় হয়। ভয় হয় পাছে প্রস্তুত হতে না হতেই কর্তব্যের আহ্বান এসে পৌঁছায। তখন মনে হয়, প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত যেন খালাসের কথা না উঠে। আজ আমি অন্তরে বাহিরে প্রস্তুত নই, তাই কর্তব্যের আহ্বান এসে পৌঁছায় নাই। যেদিন প্রস্তুত হব সেদিন এক মূহুর্তের জন্যও আমাকে কেহ আটকে রাখতে পারবে না।

'আমি যখন ধীরভাবে চিন্তা করি, তখন আমার নিঃসংশয় ধারণা জন্মে যে, আমাদের সমস্ত দুঃখ কষ্টের অন্তরে একটা মহত্তর উদ্দেশ্য কাজ করছে। যদি আমাদের জীবনের সকল মূহুর্ত ব্যাপে এই ধারণাটা প্রসারিত হয়ে থাকতো তাহলে দুঃখে কষ্টে আর কোন যন্ত্রণা থাকতো না এবং তাইতেই ত' আত্মা ও দেহের মধ্যে অবিরাম দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চলেছে।

'সাধারণতঃ একটা দার্শনিক ভাব বন্দীদশায় মানুষের অন্তরে শক্তির সঞ্চার করে। আমিও সেইখানেই আমার দাঁড়াবার ঠাঁই করে নিয়েছি এবং দর্শন-বিষয়ে যতটুকু পড়া শোনা করা গেছে সেটুকু এবং জীবন সম্বন্ধে আমার যে ধারণা আছে তাও আমার বেশ কাজে লেগেছে। মানুষ যদি তার নিজের অন্তরে ভেবে দেখবার মত যথেষ্ট বিষয় খুঁজে পায়, বন্দী হলেও তার কষ্ট নেই, অবশ্য যদি তার স্বাস্থ্য অটুট থাকে; কিন্তু আমাদের কর্ম ত' শুধু আধ্যাত্মিক

নয়—সে যে শরীরেরও কষ্ট এবং প্রস্তুত থাকলেও, দেহ যে সময় সময় দুর্বল হয়ে পড়ে।······

'একথা আমাকে বলতেই হবে যে, জেলের মধ্যে যে নির্জনতায় মানুষকে বাধ্য হয়ে দিন কাটাতে হয় সেই নির্জনতাই তাকে জীবনের চরম সমস্যাগুলি তলিয়ে বুঝবার সুযোগ দেয়। আমার নিজের সম্বন্ধে একথা বলতে পারি যে, আমাদের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত জীবনের অনেক জটিল প্রশ্নই বছর খানেক আগের চেয়ে এখন যেন অনেকটা সমাধানের দিকে পৌঁছচ্ছে। যে সমস্ত মতামত এক সময়ে নিতান্ত ক্ষীণভাবে চিন্তা বা প্রকাশ করা যেত, আজ যেন সেগুলো স্পষ্ট পরিষ্কার হয়ে উঠছে। অন্য কারণে না হলেও শুধু এই জন্যেই আমার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে, অনেকখানি লাভবান হতে পারব।'···

ঠিক এমনি সময়েই বাঙ্গলার ভাগ্যাকাশে সবচেয়ে বড় দুর্যোগ ঘনিয়ে এল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন হঠাৎ পরলোক গমন করলেন। বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতই আঘাত করলো সমস্ত বাঙ্গালীজাতিকে এই নিদারুণ দুর্ঘটনা। বিশেষ করে আঘাত পেলেন সুভাষ চন্দ্র নিজে। তিনি প্রথম বোধ করলেন যে, তিনি—তথা বাঙ্গলাদেশ অভিভাবকহীন হল। তিনি বুঝলেন এবার সত্যিকারের নেতৃত্ব তাঁর ওপর এসে পড়বে। বাঙ্গলার মধ্যে দলাদলি স্বরু হবে। গান্ধী পন্থীর দল যারা এতদিন দেশবন্ধুর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পাশে ম্লান হয়ে গিয়েছিল তারা আবার ক্ষমতা অধিকার করবার জন্যে মাথা তুলে দাঁড়াবে। এখন হয় স্বরাজ পার্টি ভেঙ্গে দিতে হবে আর না হয়ত যোগ দিতে হবে সেনগুপ্তের দলে। কোনটাই তাঁর পক্ষে যুক্তি সঙ্গত নয়। অথচ যদি স্বরাজ পার্টিকে বজায় রাখতে হয় তাহলে তাঁকে নিজেকে ব্যবস্থা পরিষদে গিয়ে কাজ করতে হবে যা আজ পর্যন্ত তিনি করেননি। অবশ্য মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত এসব প্রশ্ন ওঠে না তা তিনি জানতেন তাই সবার চেয়ে যেটা তাঁকে বেশী পীড়া দিতে লাগলো সে হল দেশবন্ধুর মৃত্যুতে বাঙ্গলার বিশেষ করে তাঁর নিজের ব্যক্তিগত জীবনে অপূরণীয় ক্ষতি। দেশবন্ধুর কাছেই

তিনি প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক জীবনের দীক্ষা নিয়েছিলেন। বহুদিন একসঙ্গে থেকেছেন এমন কি জেলের মধ্যেও আটমাস তাঁরা একত্র ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে তিনি তাঁর আদেশ পালন করে এসেছেন। যদিও, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন, 'অনেকে মনে করে যে, আমরা অন্ধের মত তাঁকে অনুসরণ করতুম। কিন্তু তাঁর প্রধান চেলাদের সঙ্গে ছিল তাঁর সব চেয়ে ঝগড়া। নিজের কথা বলতে পারি যে, অসংখ্য বিষয় তাঁর সঙ্গে ঝগড়া হত। কিন্তু আমি জানতুম যে, যত ঝগড়া করি না কেন— আমার ভক্তি ও নিষ্ঠা অটুট থাকবে—আর তাঁর ভালবাসা থেকে আমি কখনও বঞ্চিত হব না। তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, যত বড় ঝঞ্ঝা আসুক না কেন— তিনি আমাকে পাবেন তাঁর পদতলে। আমাদের সকল ঝগড়ার মিটমাট হত মার (বাসন্তী দেবীর) মধ্যস্থতায়। কিন্তু হায় "রাগ করিবার অভিমান করিবার জায়গাও আমাদের ঘুচে গেছে।'

"আমি বোধ হয় খুব বেশীদিন এখানে থাকবো না। কিন্তু খালাস হবার তেমন আর আকাঙ্ক্ষা এখন আর নাই। বাহিরে গেলেই যে শ্মশানের শূন্যতা আমাকে ঘিরে বসবে--তার কল্পনা করলেই হৃদয়টা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। এখানে সুখে দুঃখে স্মৃতি ও স্বপ্নের মধ্যে দিনগুলি একরকম কেটে যাচ্ছে। পিঞ্জরের গরাদের গায়ে আঘাত করে যে জ্বালা বোধ হয়—সে জ্বালার মধ্যেও যে কোনও সুখ পাওয়া যায় না--তা আমি বলিতে পারি না। যাঁকে ভালবাসি—যাঁকে অন্তরের সহিত ভালবাসার ফলে আমি আজ এখানে—তাঁকে বাস্তবিক ভালবাসি— এই অনুভূতিটা সেই জ্বালার মধ্যেই পাওয়া যায়। তাই বোধ হয়, বন্ধ দুয়ারের গরাদের গায়ে আছাড় খেয়ে হৃদয়টা ক্ষতবিক্ষত হলেও—তার মধ্যে একটা সুখ একটা শান্তি—একটা তৃপ্তি পাওয়া যায়। বাহিরের হতাশা বাহিরের শূন্যতা এবং বাহিরের দায়িত্ব,—এখন আর মন যেন চায় না।"

দেশবন্ধুর অবর্তমানে বাঙ্গলা দেশে যে দলাদলি সুরু হয়ে গিয়েছিল জেলে

থাকতে সুভাষবাবু সে খবর পেয়েছিলেন। এর জন্যে তাঁর মন অশান্তিতে ভরে উঠেছিল। তিনি একবার লিখেছিলেন, 'বাঙ্গালী আজ অন্ধ, কলহ বিষাদে নিমগ্ন, তাই এই কথা বুঝিয়াও বুঝিতেছে না। নিঃস্বার্থ আত্মদানের কথা আর ত' কোথাও শুনিতে পাই না। অত বড় একটা প্রাণ নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া মহাশূন্যে মিলিয়া গেল; আগুণের ঝলকার মত ত্যাগ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া বাঙ্গালীর সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিল; সেই দিব্য আলোকের প্রভাবে বাঙ্গালী ক্ষণিকের জন্য স্বর্গের পরিচয় পাইল; কিন্তু আলোকও নিভিল, বাঙ্গালীও পুরাতন স্বার্থের গণ্ডীতে আশ্রয় লইল। আজ বাঙ্গলার সর্বত্র কেবল ক্ষমতার জন্য কাড়াকাড়ি চলিতেছে। যার ক্ষমতা আছে—সে ক্ষমতা বজায় রাখিতেই ব্যস্ত। যার ক্ষমতা নাই সে ক্ষমতা কাড়িবার জন্য বদ্ধপরিকর। উভয় পক্ষই বলিতেছে, 'দেশোদ্ধার যদি হয়, তবে আমার দ্বারাই হউক, নয় তো হইয়া কাজ নাই।' এই ক্ষমতালোলুপ রাজনীতিকবৃন্দের ঝগড়া বিবাদ ছাড়িয়া, নীরবে আত্মোৎসর্গ করিয়া যাইতে পারে, এমন কর্মী আজ কি বাঙ্গলায় আর নাই?'

তবে, এই মানসিক দুশ্চিন্তার সুফল যে কিছু ছিল না, তা নয়। এর ফলেই তিনি দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ করে চিন্তা করতে আরম্ভ করেন। এবং তিনি কিষাণ-মজুর-ও-ছাত্র আন্দোলনের পরিকল্পনা করতে সুরু করেন।

ইতিপূর্বেই তার স্বাস্থ্য ভাঙ্গতে সুরু হয়েছিল। ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাস বরাবর তিনি একেবারে প্রায় উত্থান-শক্তি-রহিত হয়ে পড়লেন। তিনি ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়ায় ভুগছিলেন এবং এযাবৎ তার চল্লিশ পাউণ্ড ওজন হ্রাস পেয়েছিল। এই সময়ে তার শারীরিক অবস্থা গুরুতর দেখে সরকার থেকে তাঁকে রেঙ্গুণে স্থানান্তরিত করা হল এবং তার দাদা ডাঃ সুনীল বসু ও লেফ্‌ট্‌ন্যাণ্ট কর্ণেল কেলসাল সাহেবকে পাঠানো হল তাঁকে ভালভাবে পরীক্ষা করবার জন্যে। তারা দুজনেই মত দিলেন যে তাঁকে সুইট্‌জারলণ্ডে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো দরকার। তাঁদের যুক্ত সুপারিশ অনুযায়ী সরকার পক্ষ বললেন যে তিনি নিজের

ব্যয়ে সুইটজারলণ্ডে গিয়ে চিকিৎসা করাতে পাবেন তবে সরাসরি রেঙ্গুণ থেকেই তাঁকে যাত্রা করতে হবে, ভারতবর্ষে ফিরতে পারবেন না। সুভাষবাবু উত্তর দিলেন যে এই জেলের মধ্যে তিনি মরতে প্রস্তুত আছেন তবু এই সর্তে তিনি রাজী হতে পারবেন না। এই মর্মে তিনি তাঁর দাদা শরৎচন্দ্র বসুকে যে চিঠি লিখেছিলেন তা সত্যিই প্রণিধানযোগ্য। তার শেষাংশ উধৃত করে দেওয়া গেল ঃ

'বর্তমান ঘটনার সর্বাপেক্ষা মন্দ ফল কি হইতে পারে, তাহাও আমি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু তথাপি আমি মনে স্থির করিয়াছি, জন্মভূমি হইতে চিরকালের জন্য নির্বাসন অপেক্ষা জেলে থাকিয়া মৃত্যু বরণ করাই শ্রেয়ঃ। এই অশুভ ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়াও আমি নিরুৎসাহ হই নাই। কারণ, কবির উক্তিতে আমি বিশ্বাস করি ঃ—গৌরবের পথ শুধু মৃত্যুর দিকে লইয়া যায়।··· মুক্তিলাভের পূর্বে আমাদিগকে ব্যক্তিগতভাবে ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। ভগবানকে ধন্যবাদ দিই যে আমি নিজে শান্তিতে আছি এবং সম্পূর্ণ নির্বিকার ভাবে সকল অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত আছি। আমাদের সমগ্র জাতির কৃত পাপের জন্য আমি প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি—ইহাতেও আমাদের তৃপ্তি। আমাদের চিন্তা ও আদর্শ অমর হইয়া থাকিবে।

'আমাদের মনোবৃত্তি জাতির স্মৃতি হইতে কখনও মুছিয়া যাইবে না, ভবিষ্যৎ বংশধরগণ আমাদের প্রিয় কল্পনার উত্তরাধিকারী হইবেন, এই বিশ্বাস লইয়া আমি চিরদিন সকল প্রকার বিপদ ও অত্যাচার হাসিমুখে বরণ করিয়া লইয়া কাল কাটাইতে পারিব।'···

এর পর সরকার 'বাহাদুর' আর তাঁকে আটক রাখতে সাহস করলেন না। ১৬ই মে ১৯২৭ সালে তিনি সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করলেন।

কিন্তু এই কি সেই সুভাষ? ভগ্নস্বাস্থ্য—শীর্ণদেহ—যৌবনের সেই দীপ্তি অনেক খানি ম্লান হয়ে এসেছে—সাম্রাজ্যবাদীর নিষ্ঠুর নির্যাতনে তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে আসছে জীবনীশক্তি।...

এ যেন মানুষ নয়—দেশমাতৃকার চরণে অঞ্জলি বদ্ধ প্রাণের অর্ঘ্য মাত্র।

বহুদিন পর বহু সরস শ্যামল উর্বর মাঠ পার হয়ে প্রত্যাশিত পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘ যখন মরুভূমির ওপরের আকাশকে সমাচ্ছন্ন করে ঘনিয়ে এল, তখন অনেক জল তার মরে গেছে। অনেক মেঘ তার ঘূর্ণি বাতাসে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে গেছে। আহত, স্তব্ধ মরুর মাটি তাব হলুদ তৃষ্ণার সমুদ্র নিয়ে চেয়ে রইলো সেই মেঘের পানে নির্নিমেষ মিনতি নিয়ে।

তবু, দু'চার ফোঁটা জলেবও প্রয়োজন আছে মরুর বুকে।

প্রয়োজন আছে ক্ষয়গ্রস্ত স্থভাষের সামান্যতম কর্মপ্রচেষ্টার। 'বন্ধু'হারা বাঙ্গালীর প্রয়োজন আছে সত্যিকারের কল্যাণকামীর!

আন্দোলন স্বরু করে দিলেন স্বভাষচন্দ্র। এবারের আন্দোলন কিষাণ মজুর আর ছাত্রদের নিয়ে। এব আগে কিষাণ-মজুরদেব নিয়ে আন্দোলন করে নি কংগ্রেস। ১৯১৮ সালে মহাত্মাজী অবশ্য আহমেদাবাদে মজুরদের নিয়ে একবার আন্দোলন করবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সে আন্দোলন বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। তারপর স্থভাষবাবুর বন্দীজীবনের সময়ে কমিউনিষ্ট ও এম এন রায়েব দল আন্দোলন চালাবার চেষ্টা কবেছিল বটে কিন্তু সে আন্দোলন ঠিক ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যোগ ছিল না। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও কিছুটা আন্দোলন করবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাঁর আলোচনা ও মতবাদ এত জটিল ও সূক্ষ্ম যে সাধারণে তা সহজে গ্রহণ করতে পারেনি। তাই এই সময়ে স্থভাষবাবুর প্রয়োজন ছিল। তিনিই প্রথম কংগ্রেসের পতাকাতলে কিষাণ মজুরদের জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করে তুললেন। দলে দলে তাঁর আন্দোলনে যোগ দিতে লাগল সকলে।

এই বছর স্বভাষবাবু জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে কংগ্রেসের যুগ্ম-সম্পাদকরূপে নিযুক্ত হলেন।

এর পর ১৯২৮ সাল। এই বৎসর লাক্ষ্ণৌতে সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল নেহরুর কমিটি অনুমোদিত রিপোর্টটি মেনে নেওয়া। এই রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়েছিল যে কংগ্রেসের লক্ষ্য হবে ডোমিনয়ান স্টেটাস বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন তবে এর বিরুদ্ধে যে সব দল পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করবেন তাঁরাও তাদের মত অনুযায়ী কংগ্রেসের দলভুক্ত থেকেই কাজ করতে পারবেন। সুভাষচন্দ্র এই নেহরু কমিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ করলেন। তার সঙ্গে এসে দাড়ালেন পণ্ডিত জওহরলাল ও শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার। এই তিনজনে যে একটা দল গঠন করলেন তার নাম হল Independence League বা স্বাধীনতা সঙ্ঘ।

তাছাড়া এই বছরেই সাইমন কমিশন প্রেরিত হয়। কংগ্রেস ঠিক করলেন কৃষ্ণ পতাকা উত্তোলন ও বয়কট দিয়ে তারা দেশব্যাপী প্রতিবাদ জানাবেন এই কমিশনেব বিরুদ্ধে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র চাইলেন শুধু বয়কট নয়, নিষ্ক্রীয় কর্মপন্থা নয়—এই সুযোগ নিয়ে দেশব্যাপী বিপ্লব সুরু হোক। তিনি গান্ধীজীকে অনুরোধ করলেন সকলের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে এই আন্দোলন পরিচালনা করতে। সুভাষবাবু সেদিন ঠিকই অনুমান করেছিলেন যে এই হচ্ছে বিপ্লব সুরু করার সুবর্ণ সুযোগ। পরবর্তীকালে সেই আন্দোলন ১৯৩০ সালে গান্ধীজী সুরু করেছিলেন কিন্তু সুভাষবাবুর পরামর্শ মত কাজ করতে পারলে ১৯২৮ সালেই সেই আন্দোলন সুরু হয়ে যেতো। তাতে আমাদের মুক্তি সংগ্রাম আরও দুই বছরের জন্যও এগিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হল না। সুভাষবাবু গান্ধীজীর মত পেলেন না। অথচ সেই বছর ক্রমান্বয়ে, মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সম্মেলন, নিখিল-বঙ্গ ছাত্র সম্মেলন, নিখিল-ভারত যুব-কংগ্রেস প্রভৃতি এতগুলো সভা সমিতিতে যোগ দিয়ে বক্তৃতা দিয়ে সুভাষবাবু অনেকটা জনসাধারণের মনের অবস্থা সম্বন্ধে জানতে পেরেছিলেন। তিনি বার বার উপলব্ধি করেছিলেন যে জনসাধারণ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তাছাড়া তিনি ঐসময়ে জনসাধারণের সামনে তাঁর নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত কর্মপন্থার কথাও ভাল করে তুলে

ধরেছিলেন। তিনি জানতেন সকলে সে পন্থা গ্রহণ করবে। সেই সময়েই তিনি প্রথম গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন সক্রিয় কর্মপন্থা চাই, পণ্ডিচেরী আশ্রমের অরবিন্দ ঘোষ এবং সবরমতি আশ্রমের গান্ধীজীব নিষ্ক্রিয় প্রতিবাদের পন্থা দিয়ে আর চলবে না।

কিন্তু তবু গান্ধীজী বললেন যে দেশ আন্দোলনের জন্য তৈরী নেই।

যাই হোক এর পর কোলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনের দিন ঘনিয়ে আসছে। কংগ্রেস নেতারা অনুমান করেছিলেন এইখানে হয়ত বামপন্থীদের সঙ্গে সত্যিই বোঝাপাড়া করতে হবে। তাই গান্ধীজী বললেন যে বামপন্থীদের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী মেনে নেওয়া হবে তবে সবটা নয়, তার মধ্যে কিছু পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র বললেন কোনও রকম সর্ত না দিয়েই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী মেনে নিতে হবে। জওহরলালও খুব জোরালো বক্তৃতা দিয়ে সমর্থন করলেন। ফলে গান্ধীজীর ছাঁটাই প্রস্তাব ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে গেল। গান্ধীজী এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা বামপন্থীদের শক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ হয়ে উঠলেন!

এরপর কথা উঠলো কংগ্রেসের আগামী সভাপতি নির্বাচন নিয়ে। সকলেই বোধ করেছিলেন যে এই সময় এমন একজন সভাপতির প্রয়োজন যিনি দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে কংগ্রেসের মধ্যে এই দলাদলির মীমাংসা করতে পারবেন। সেইজন্য গান্ধীজীর নাম প্রস্তাব করা হল। কিন্তু গান্ধীজী এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। কারণ তিনি অত্যন্ত কূটনৈতিক নেতা। তিনি তাঁর দূরদৃষ্টির বলে জানতে পারলেন এই সময়ে পণ্ডিত জওহরলালকে সভাপতি করতে পারলে বামপন্থীদের মধ্যে অনেকটা ভাঙ্গন এসে যাবে। হলও তাই আসলে। সভাপতি নির্বাচিত হবার পর পণ্ডিতজী বামপন্থীদের আদর্শ ত্যাগ করে দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে একটা মিটমাটের চেষ্টা করতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, এই ১৯২০ সাল থেকে বরাবর জওহরলাল গান্ধীজীর একনিষ্ঠ অনুগামী হয়ে আছেন।

ডিসেম্বার মাসে লাহোর অধিবেশন হবার কথা হল। কিন্তু তার আগেই

বড়লাট আরুইন গোল টেবিল বৈঠকের কথা ঘোষণা করলেন। তাছাড়া আরও বললেন যে ১৯১৭ সালের ঘোষণা অনুযায়ী সহজেই প্রতীয়মান হয় যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনই ভারতের শাসন ব্যবস্থার চরম পরিণতি।

এই ঘোষণা শুনে দিল্লীতে সর্বদলীয় সম্মিলনের নেতারা মিলিত হলেন এবং বড়লাটের নিকট এই মর্মে এক স্মারকলিপি পাঠালেন যে তাঁরা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন করার বিষয়ে সরকার পক্ষের সহিত সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছেন। জওহরলালও তাতে সই করলেন। এদিকে সুভাষবাবু একটা বিরুদ্ধ ঘোষণাপত্র তৈরী করে পাঠালেন। তবু শেষ পর্যন্ত গান্ধীজী, মতিলাল নেহরু এবং ভি, জে, প্যাটেল আরুইনের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে গেলেন। কিন্তু তাদের ফিরতে হল ভগ্নমনোরথ ও শূন্য হাত নিয়ে। মহাত্মাজী লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী নিয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করলেন কিন্তু তার সঙ্গে আর একটি লাইন যুক্ত করে দিলেন এই মর্মে যে, মহামান্য বড়লাট বাহাদুর যে দৈবক্রমে বোমার আঘাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন তাতে কংগ্রেস তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। সেই সময় আরুইনের ট্রেণে বোমা মারা হয়েছিল কিন্তু তিনি দৈবক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন। যাই হোক গান্ধীজীর এই প্রস্তাবে সুভাষবাবু পরিচালিত উগ্র জাতীয়তাবাদী তরুণের দল অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে উঠলো। জোর প্রতিবাদ জানানো সত্ত্বেও গান্ধীজীর এ প্রস্তাব গৃহীত হয়ে গেল।

এদিকে সুভাষচন্দ্র আর একটি প্রস্তাব তুললেন। তিনি বললেন যে কংগ্রেস যে শুধু পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করছে তা নয় কংগ্রেস সঙ্গে সঙ্গে সিন ফিনের আদর্শ অনুযায়ী এক স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট গঠন করবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের কিষাণ মজুর ও যুব সম্প্রদায়কে জাগিয়ে তুলবে। কিন্তু কংগ্রেস তাঁর এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে দিলে। তাইতে তিনি বলেছিলেন যে, কংগ্রেস আজ যে কথার মর্ম বুঝলো না তার মর্ম সে আরও এক বছর পর উপলব্ধি করতে পারবে। কিন্তু তার জন্যে যতখানি সময় নষ্ট হয়ে যাবে তা আমাদের সংগ্রামের পক্ষে অমূল্য।

কংগ্রেস এর প্রত্যুত্তর দিয়েছিল। বাক্যে নয় কার্যে। পণ্ডিত জওহরলালের নেতৃত্বে কংগ্রেস সুভাষচন্দ্র ও শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে বহিষ্কৃত করে দিলে।

অবিশ্বাস্য হলেও একথা সত্য। একথা সত্য যে কংগ্রেস নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে বিতাড়িত করে দিয়েছিল তাদের কর্ম পরিষদ থেকে !

কিন্তু ভারতের যুব সম্প্রদায় তাঁকে মাথা নত করে গ্রহণ করেছিল সেই সময়ে। তরুণ সম্প্রদায় তাঁকে নেতার আসনে বসিয়ে যে সম্মান দেখিয়েছিল তার কাছে অন্যান্য সমস্ত কংগ্রেসী নেতার জনপ্রিয়তা ম্লান হয়ে গিয়েছিল, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে। নওজোয়ান ভারত সভার যুব সম্মিলনের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, যে ভারতের যুব সম্প্রদায় দিয়েই ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বরাবরই তরুণের পূজারী। তাই তিনি বলেছিলেন, তরুণের মধ্যে যে শক্তি আছে যে প্রাণ আছে তার উচিৎ মর্যাদা দিতে হবে। প্রবীন রাজনৈতিকদের পদতলে আমাদের নবীন প্রাণের বুদ্ধি বিবেচনাকে সমর্পণ করা আমি কোন দিন সহ্য কববো না।

এই ডাকে সাড়া দিয়েছিল সারা ভারত ব্যাপী তরুণের দল।

শুধু ভারতে নয়, বাঙ্গলা দেশেও ভীষণ দলাদলি সুরু হয়ে গিয়েছিল। যদিও দেশবন্ধুর অবর্তমানে সুভাষবাবুই ছিলেন বাঙ্গলার অবিসংবাদী নেতা তবু, তিনি যখন ভারতের বাইরে নির্বাসিত ছিলেন সেই অবসরে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের দল বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। যতীন্দ্রমোহন একাধারে স্বরাজ পার্টির নেতা ও কর্পোরেশনের মেয়র নিবাচিত হয়ে ছিলেন। যতীন্দ্রমোহন দেশবন্ধুর অনুগামী হলেও তিনি দেশবন্ধুর মতবাদের সঙ্গে গান্ধীবাদের একটা অসম্ভব রকমের মিশ্রণ করতে চেয়েছিলেন। সে ভাবধারা একমাত্র সুভাষবাবুর অবর্তমানেই কিছুটা চল হয়েছিল কিন্তু সুভাষবাবুর মুক্তির পর তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও আত্মত্যাগের পাশে দাঁড়াতে পারে নি। তবে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী-

NABADWIPA JANATHA PATHAGAR

দল যতীন্দ্রমোহনকে সাহায্য করতো। আশা ছিল তাহলে সুভাষবাবুর প্রভাব খর্ব হয়ে যাবে। যাই হোক সুভাষবাবু মান্দালয় থেকে ফেরবার পর সমস্ত বাঙ্গলাদেশ যখন সুভাষবাবুর মতবাদের দিকে ঝুঁকে পড়লো তখন অনন্যোপায় হয়ে যতীন্দ্রমোহন লাহোর কংগ্রেসে বাঙ্গলার প্রাদেশিক নির্বাচনে বৈধতা অবৈধতা সম্বন্ধে প্রস্তাব তুললেন। কংগ্রেস মতিলাল নেহরুকে ব্যাপারটা পর্যালোচনা করবার জন্যে বাঙ্গলায় পাঠালেন। তিনি সমস্ত অনুসন্ধান করে সুভাষবাবুর পক্ষেই রায় দিয়ে গেলেন। কিন্তু যতীন্দ্রমোহনের দল তাতেও ক্ষান্ত না হয়ে পাশাপাশি আর একটা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গঠন করলে। এবং সমস্ত নির্বাচনে এমন কি মেয়রের নির্বাচনেও যতীন্দ্রমোহন সুভাষবাবুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে নামলেন। কিন্তু আসলে যতীন্দ্রমোহনের কোন প্রভাব ছিল না জনসাধারণের ওপর। তাই ভোটে প্রতি পদে যতীন্দ্রমোহনকে পরাজয় বরণ করে নিতে হল। এর পর থেকে যতীন্দ্রমোহনের দল আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে নি। তবে বাঙ্গলার এই দলাদলির ইতিহাস বাঙ্গলার রাজনৈতিক ইতিহাসের একটা মস্ত বড় কলঙ্কের অধ্যায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বাঙ্গলার বীর নেতা সুভাষচন্দ্র যখন সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে দক্ষিণপন্থী, সেকেলে আপোষপরায়ণ কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালাচ্ছেন— দেশকে আরও বৃহত্তর ত্যাগ ও সংগ্রামের দিকে চালনা করতে চেষ্টা করছেন— তাঁর একমাত্র লক্ষ্য যখন ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা তখন তাঁরই প্রদেশে সামান্য ক্ষমতার লোভে তাঁকে এমনভাবে বিব্রত করা মোটেই দেশভক্তির পরিচয় নয়। সুভাষবাবুর আদর্শ সক্রিয় সংগ্রামের আদর্শ, জ্বলন্ত দেশপ্রেম ও অপূর্ব ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত সে পথ। তার পাশে জনজাগরণের যুগে অন্য কোন আদর্শ স্থান পেতে পারে না। যে আদর্শ মানুষকে স্বতঃই উদ্বুদ্ধ করে তোলে, বৃহত্তর কর্মপ্রেরণায় চঞ্চল করে তোলে তাকেই বলি আদর্শ। দল করে বা অন্য কোন নেতার সুনাম ও জনপ্রিয়তার দোহাই দিয়ে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা যায়

না। সুভাষবাবুকে জয়তিলক পরিয়ে সেদিন বাঙ্গলা দেশ এই কথারই কাযত পরিচয় দিয়েছিল। এবং যারা সেই পরিচয় দিয়েছিল তারা আমাদের দেশেব অতি সাধারণ শ্রেণীর মানুষ—সেই কিষাণ ও মজুরের দল আর তাদের সাথে সাথে ছিল যুগে যুগে সমস্ত দেশের সমস্ত সংগ্রামের যারা অগ্রদূত সেই তরুণ ছাত্র সম্প্রদায। সুভাষবাবুর জয় বাঙ্গালীর প্রাণের জয়!

এর পর ১৯৩০ সাল। অসহযোগ আন্দোলনের পুনরাবৃত্তি। প্রতি বাবে যেমন হয়ে থাকে এবারেও বাঙ্গলা দেশ সুভাষবাবুর নেতৃত্বে এগিয়ে এলো আন্দোলনের পুরোভাগে। সুভাষবাবু, যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতি সকলেই কারারুদ্ধ হলেন। এই সময় আলীপুর জেলে ওযার্ডারদের অভদ্র ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে পাঠান বন্দীদেব হাতে সুভাষবাবু তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে লাঞ্ছিত হলেন। লাঠির আঘাতে এক ঘন্টারও বেশী সময় তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। বিক্ষোভের তবঙ্গে সমস্ত দেশ উদ্বেল হয়ে উঠলো। সরকাব থেকে ব্যাপারটা ধামাচাপা দেওযার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু সফল হল না। দেশব্যাপী প্রতিবাদ ও প্রতিকারের দাবী জানিযে আন্দোলন চলতে লাগলো। এই সমযের মধ্যেই আবাব কোলকাতাব অধিবাসীবা সুভাষবাবুকে মেয়র নির্বাচিত করলেন।

কিছুদিনের জন্য তিনি মুক্তি লাভ করলেন এবং এই সময়ে মজুরদের পক্ষ থেকে তিনি নিখিল ভাবত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। কিন্তু বেশীদিন আর জেলের বাইবে তাঁর থাকা হল না। ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসের এক শোভাযাত্রা পরিচালনা করতে গিয়ে তিনি গ্রেপ্তার হলেন। শুধু গ্রেপ্তার নয়, শোভাযাত্রার ওপর পুলিশ লাঠি চালনা করায় অনেকের সঙ্গে তিনিও আহত হয়েছিলেন। কিন্তু এবারেও তাঁকে বেশীদিন জেলে থাকতে হয় নি। কারণ এই সময় জগৎ বিখ্যাত গান্ধী আরুইন চুক্তি সম্পাদিত হয়, এবং তার ফলে তিনি মুক্তিলাভ কবেন।

আরুইনের সাথে চুক্তির ফলে গান্ধীজী হঠাৎ অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দেবার আদেশ দেন। তার ফলে দেশবাসী বিশেষ করে তরুণ সৈনিকের দল অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে এবং গান্ধীজীর ওপর শ্রদ্ধা হারাতে থাকে। তাছাড়া গান্ধীজী আরুইনের সঙ্গে পরামর্শ করার আগে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে ফাঁসির অপরাধে দণ্ডিত ভগত সিংহের ফাঁসি তিনি নাকচ করবার সাধ্যমত চেষ্টা করবেন। অথচ আরুইনকে এই বিষয়ে মোটেই তিনি রাজী করাতে পারলেন না, এদিকে আন্দোলনও হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। উপরন্তু ২৩শে মার্চ যেদিন করাচীতে কংগ্রেসের অধিবেশন বসবে ঠিক সেইদিনই ভগত সিংহ সুখদেব এবং রাজগুরুর ফাঁসি হয়ে গেল। সমস্ত তরুণ সমাজ একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো এই খবর পেয়ে। গান্ধীজী যখন করাচীতে এসে পৌছলেন তখন কৃষ্ণ পতাকা দিয়ে তাঁকে 'সম্বর্ধনা' জানানো হল। এমন কি কেউ কেউ ঢিল পর্যন্ত ছুঁড়লো। এদিকে আবার সুভাষবাবুর নেতৃত্বে একই সময়ে কংগ্রেস অধিবেশনের পাশাপাশি যুব সম্প্রদায়ের অধিবেশন সুরু হয়ে গেল। সুভাষবাবু প্রকাশ্য সভায় গান্ধীজীর নীতির নিন্দা করলেন। তিনি বললেন গান্ধী-আরুইন চুক্তি দেশবাসীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। তাছাড়া তিনি বললেন যে আগামী গোল-টেবিল বৈঠকে একমাত্র গান্ধীজীই ভারতের সঠিক প্রতিনিধি হতে পারেন না।

সমস্ত উগ্রপন্থীরা এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন বটে কিন্তু ওদিকে কংগ্রেস মণ্ডপে গান্ধীজীকেই একমাত্র প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করে দেওয়া হল। এমন কি ভগত সিংহের বাবা কিষেণ সিংহও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলে। গান্ধীজীরই জয় হল করাচীতে।

যাই হোক, গোল টেবিল বৈঠকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার আগে ১৯৩২ সালে গান্ধীজী বোম্বাইতে এক মিটিং ডাকলেন। সুভাষবাবু ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য না থাকলেও তাঁকে বিশেষ আমন্ত্রণ পাঠানো হল একটা মীমাংসা করবার জন্যে।

যুদ্ধরত আজাদ-হিন্দ-ফৌজের জনৈক সৈনিক

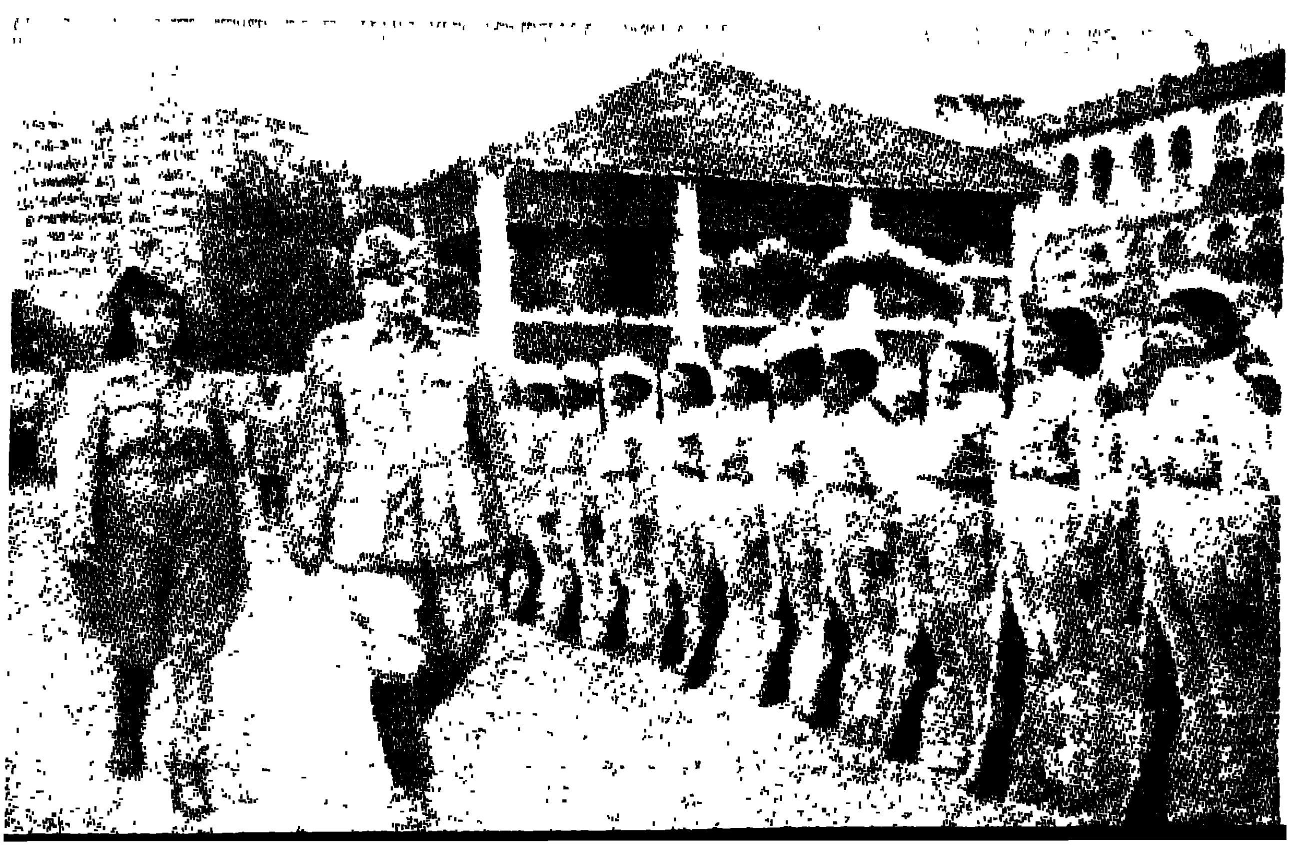

সোনান রেডিও স্টেশন হইতে নেতাজীর বক্তৃতা

কিন্তু বোম্বাইতে যাবামাত্র তিনি গ্রেপ্তার হলেন। একেই ত মান্দালয় জেলে তাঁর শরীরে যক্ষ্মার পূর্বাভাস দেখা গিয়েছিল, এবারে জেলের মধ্যে তাঁর শরীর একেবারে ভেঙ্গে গেল। কর্তৃপক্ষ চিকিৎসার জন্য তাঁকে ইউরোপে পাঠাবার সঙ্কল্পে ১৯৩৩ সালে তাঁকে মুক্তি দিলেন। তবে এই সর্ত রইলো যে সরাসরি জেল থেকেই তাঁকে ইউরোপ যাত্রা করতে হবে, মধ্যে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না।

জীবনের ধারা

(২)

দুই ধরণের নদী আছে। এক ধরণের নদী যতটুকু শক্তি পায় উৎসের গর্ভ থেকে ঠিক ততটুকু শক্তি নিয়েই এগিয়ে চলে। চলতে চলতে যখন নিজের প্রাণের জোর আসে ফুরিয়ে তখন কাছাকাছি একটা বড় নদীর বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিকিয়ে দেয় নিজের স্বকীয় ধারাকে। এবং সেই বৃহৎ নদীর প্রবাহের সঙ্গে এক হয়ে কোনওগতিকে যখন সাগরের মোহনায় এসে পৌছয় তখন তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় বটে কিন্তু আপনার সত্বাকে জাগ্রত রেখে নয়। কিংবা এমনও কোন কোন নদী আছে যারা হাতের কাছে আত্মসমর্পণ করবার মত কোন বড় নদী না পেয়ে পথে যেতে যেতেই খানিকটা ব্যাপ্তির মাঝে মুখ লুকিয়ে চিরকালের মত থমকে দাঁড়িয়ে যায়।

আর এক ধরণের নদী আছে, যে নদী সাগরের মোহনা পর্যন্ত না পৌছে আপনাকে হারাতে পারে না। যতদূর হোক, যত দুস্তর সে পথ হোক তবু সে আসবে, আপনার উন্মত্ত জীবন-প্রবাহে প্রধাবিত হয়ে আসবে সাগরের আশে।

পাহাড়ের বুক কেটে প্রপাতের পর প্রপাত ডিঙ্গিয়ে, রাত্রির মত ঘন বন পেরিয়ে আবার ধূ-ধূ—করা রিক্তক্ষেত্র পার হয়ে সে ছুটে চলবে আপনার প্রাণশক্তির জোয়ারে।

মানুষের জীবন ত নয় যেন এক একটা প্রবাহমান নদী। শুধু বাহ্যিক বা দৈহিক বেঁচে থাকার মধ্যে নয়, অন্তরে অন্তরে যে প্রাণশক্তি বন্যার মত বয়ে চলে, যে শক্তি আগিয়ে নিয়ে চলে দেহের যন্ত্রটাকে ঘটনার পর ঘটনার স্তুপ ঠেলে — সেই প্রাণশক্তির ধারা নদীর মতই উত্থান আর পতনের আবর্তে চিহ্নিত। এই ত জীবন! এই জীবনের মাঝেই কত ঢেউ—কত ওঠা আর পড়া—এবং এই ওঠা-পড়ার সমষ্টিগত একটা বেগে মানুষ এগিয়ে চলে—এগিয়ে চলে জীবন-নদী। সে নদী কোন কোন ক্ষেত্রে চলার পথেই হারায় আপন সত্বা আবার কোন কোন ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রাণশক্তির বলেই লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছয়।

যাঁরা মহামানব তাঁদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের তুলনা এই দিক থেকে অতি সহজেই করা যেতে পারে। কেবল এঁদের ক্ষেত্রে বৃহত্তর পরিবেশ আর বিশালতর বিস্তারের প্রশ্ন মাত্র— ধারা সেই এক।

সুভাষচন্দ্রের জীবন এই শেষ পর্যায়ের নদী যার লক্ষ্যের মোহনায় ছুটে যাবার একটা প্রচণ্ড শক্তি আছে, যে শক্তি ভারতের মুক্তি সংগ্রামের উজ্জ্বল ইতিহাসের কূলে কূলে উচ্ছসিত হয়ে বয়ে চলেছে—কখনও সঙ্গীতের মত মধুর সে প্রবাহের সুর, কখনও বা বন্যার গর্জনের মত প্রচণ্ড! এ নদীর পথে শুধু যে পাহাড় আর জঙ্গল আছে তা নয়, আছে অনেকগুলো প্রপাত। প্রথম প্রপাত মান্দালয়ের নির্বাসন আমরা দেখেছি, দ্বিতীয় প্রপাত ইউরোপের প্রবাস! প্রপাত অর্থাৎ দ্বিগুণতর প্রচণ্ডতা!

*   *   *   *

১৯৩৩ সালের গোড়ার দিকে সুভাষবাবু ইউরোপ যাত্রা করলেন। তবে যাত্রার আগে কর্তৃপক্ষ আদেশ দিলেন যে তিনি জার্মানীতে প্রবেশ করতে পারবেন

না। জার্মাণীতে তখন হিটলারের অভ্যুদয় সূচিত হয়ে গেছে। এই নিদেশের মূলে বোধ হয় তাই-ই ছিল।

যাই হোক সুভাষবাবু প্রথমে ভিয়েনায় এসে নামলেন। অস্ট্রিয়ার নগরী তখন সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা পরিচালনা করছে মিউনিসিপ্যালিটি তাদের হাতে। অথচ ফ্যাসিস্টরাও বিশেষ শক্তিশালী দল গঠন করে তুলেছে। সুভাষবাবু কোন বিশেষ দলের দিকে কোন বিশেষ অনুরাগ না দেখিয়ে দুইদলের মধ্যে বিশেষ আলাপ-আলোচনা সুরু করে দিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে দুই দলের কাছ থেকেই অনেক কিছু ভাল জিনিষ শেখবার ও গ্রহণ করবার আছে। তিনি নিজে দেশে থাকতে কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটির কর্ম-পদ্ধতির সঙ্গে বিশেষ জড়িত ছিলেন তাই ভিয়েনাতেও সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের সঙ্গে মিশে তাদের মিউনিসিপ্যালিটির কাযকলাপ পরিদর্শন করতে লাগলেন, আধুনিকতম শাসনব্যবস্থা শিক্ষা করতে লাগলেন। ওদিকে ফ্যাসিস্টদের মধ্যে যে শৃঙ্খলা, দৃঢ়তা ও নিয়মানুবর্তিতা আছে যে সবও তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করতো। তাই ফ্যাসিস্টদের কুচকাওয়াজেও তাঁকে উপস্থিত থাকতে দেখা গিয়েছে। এই সময় স্থানীয় মেয়র কার্ল সিয়েটুজের সাথে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠতা হয়। তিনি সোশ্যালিস্টদের নাগরিক শাসন ব্যবস্থা দেখে অভিভূত হয়েছিলেন কিন্তু সোশ্যালিষ্ট পার্টির মধ্যে নিজেকে এক করে ফেলেন নি।

সুভাষবাবু যখন ভিয়েনায় এসে পৌছলেন তখন কেন্দ্রীয় পরিষদের ভূতপূর্ব সভাপতি বিঠলভাই প্যাটেল চিকিৎসার জন্য ওখানে অবস্থান করছিলেন। বিঠলভাই প্যাটেল তাঁর রাজনৈতিক জীবনে সকল ক্ষেত্রে গান্ধীদের অনুগামী ছিলেন না, উপরন্তু কয়েকটা বিষয়ে তিনি সুভাষবাবুর অনুসৃত পন্থারই অনুরক্ত ছিলেন। বিঠলভাইকে পেয়ে সুভাষবাবু খুব উৎসাহিত বোধ করলেন। এবং এই দুই অসুস্থ নেতা সম্মিলিত ভাবে গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য সুরু করে দিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল গান্ধীজীর ক্ষীয়মান প্রভাব থেকে দেশকে সম্পূর্ণ-

ভাবে মুক্ত করে একটা সক্রিয় কর্মপন্থার নির্দেশ দেওয়া এবং দ্বিতীয়তঃ ইউরোপে ভারতবর্ষের আন্তরিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক একটা পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া। এই মহৎ কার্যের জন্য বিঠলভাই প্যাটেল সুভাসবাবুর হাতে এক লক্ষ টাকা দান করলেন।

প্রথমেই তারা দুজনে এক যুক্তবিবৃতি বের করলেন। তাতে লেখা ছিল যে, অসহযোগ আন্দোলনের এই হঠাৎ অবসান গান্ধীজীর নেতৃত্বের ব্যর্থতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আমরা স্পষ্টই ঘোষণা করছি যে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে গান্ধীজী ব্যর্থ হয়েছেন। গান্ধীজীর পূর্বেকার কর্ম-পদ্ধতির সহিত সামঞ্জস্যহীন এই যে বর্তমান কার্যনীতির একঘেয়ে পুনরাবৃত্তির চেষ্টা এ সব সম্পূর্ণ দূর করে কংগ্রেসকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে কংগ্রেস সম্পূর্ণ নতুন এবং সময়োপযোগী নেতার বিধান অনুযায়ী কোন সক্রিয় এবং মৌলিক পন্থা অবলম্বন করতে পারে।

অন্যত্র সুভাষবাবু তাঁর ইংরাজী পুস্তক 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগলে' লিখেছিলেন, গান্ধীজীর ব্যর্থতার কারণ এ নয় যে তিনি সমর্থন পাননি। বরঞ্চ অন্যান্য দেশে যে অল্পসংখ্যক লোক নিয়ে অন্যান্য দেশের নেতারা তাঁদের দেশকে মুক্ত করতে পেরেছেন গান্ধীজী তার থেকে অনেক বেশী সমর্থন পেয়েছেন। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে গান্ধীজী যেমন তাঁর নিজের দলের লোকদের চিনতে পেরেছিলেন সেই পরিমাণে তাঁর বিরুদ্ধ দলকে কিছুই বুঝতে চেষ্টা করেন নি। ভারতের ভবিষ্যত—যে সমস্ত বীর সৈনিকের দল নির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করে ত্যাগ ও নির্যাতনের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, তাদের হাতের ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করছে।

সুভাষবাবুর এই সমালোচনা—গান্ধীবাদের ওপর এই আক্রমণ ইউরোপ খুব উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। চারদিক থেকে তাঁর লেখা পড়বার আগ্রহ দেখা গিয়েছিল। ইউরোপে থাকতেই তিনি তাঁর পুস্তক 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল্' সম্পূর্ণ করেন। এই বই ইংলণ্ডে প্রথম প্রকাশিত হবার পর স্যর সামুয়েল হোর

ভারতে এই বইয়ের প্রচার আইনতঃ নিষিদ্ধ করে দিলেন। ইংলণ্ড সুভাষবাবুকে যে চোখেই দেখুক অন্যান্য ইউরোপীয় রাজ্য তাঁকে যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছিল। বিশেষ করে বল্কান রাজ্যগুলিতে তিনি সব চেয়ে বেশী উৎসাহ পেয়েছিলেন। বাঙ্গলা দেশের মত এই বল্কান রাজ্যগুলিতে অনেকবার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন হয়ে গিয়েছে। বোধ হয় সেইজন্যই বীর সৈনিক সুভাষচন্দ্রের মন এই দেশগুলির দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। বেলগ্রেডে থাকতে সুভাষবাবুকে কেন্দ্র করে একটা মজার ঘটনা ঘটে। বেলগ্রেডের মুখপত্র 'পলিটিক' তাঁকে ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখতে অনুরোধ করে। তারা বলে যে কিছুদিন আগে রামপুরের নবাব ভারতে বৃটিশ শাসনের প্রশংসা করে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার প্রত্যুত্তরে জাতীয়তাবাদী কোন লেখকের মন্তব্য তারা প্রকাশ করতে চায়। সুভাষবাবু এই প্রবন্ধ লিখেছিলেন কিন্তু বৃটিশের মধ্যস্থতায় এই প্রবন্ধ ছাপাতে দেওয়া হয় নি। উপরন্তু রয়টার দেশবিদেশে খবর পাঠিয়ে দিলে যে বেলগ্রেডে সুভাষবাবু কিছুই সম্বর্ধনা পান নি ইত্যাদি। পরে অবশ্য সমস্ত ঘটনা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে সুভাষবাবু এক প্রবন্ধ লেখেন।

এমনি করেই ভারতে বৃটিশ শাসনের বর্বরতার বিরুদ্ধে ভারতীয় কণ্ঠে প্রতিবাদের স্বর প্রথম সুভাষবাবুর প্রচারকার্যের মধ্যেই ধ্বনিত হয়ে ওঠে। পরবর্তী যুগে অবশ্য জওহরলাল এবং আরও পরে অতি আধুনিক যুগে বিজয়লক্ষ্মী যথেষ্ট এ বিষয়ে সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন কিন্তু সুভাষবাবুই যে এ পথের পথপ্রদর্শক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর রাজনৈতিক মতামত নিয়ে যতই মতানৈক্য থাকুক না কেন এই দিক দিয়ে তাঁর অবিস্মরণীয় দান সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে নেবে। এবং এ বিষয়ে তাঁকে সকল বিষয়েই যিনি সাহায্য করেছিলেন সেই বিঠলভাই প্যাটেলকে সকলে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। ছাত্রাবস্থা থেকেই সুভাষবাবুর মনে যে আত্মমর্যাদা ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়ে উঠেছিল ইউরোপে এসে তার আরও বিরাটতর রূপে আত্মপ্রকাশ দেখা গেল।

জগতের রাজনৈতিক ইতিহাসের অধ্যায়ে সুভাষবাবুর নাম চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেল।

শুধু রাজনৈতিক আত্মমর্যাদার প্রশ্ন নয়, বিদেশে বৃটিশজাতি ভারতবর্ষের সামাজিক ও নৈতিক জীবন নিয়ে যে সমস্ত মিথ্যা রটনা সুরু করেছিল—বিশেষ করে বৃটিশের স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র্য ও সর্বাঙ্গীন অভাব অনটনের সুযোগ নিয়ে যে সমস্ত পুস্তক ও সিনেমার ছবি প্রকাশিত ও প্রচারিত হত সুভাষবাবু সে সবের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে আন্দোলন সুরু করে দেন। তাঁর চেষ্টাতেই ভারতে ইংরাজ শাসনের মিথ্যা গৌরবময় ঘটনার ছবি 'বাঙ্গালী' প্রদর্শন বন্ধ হয়। সুভাষবাবু জানিয়েছিলেন দেশকে যে ইউরোপে এমন ছবিও দেখানো হয়েছে যেখানে দেখা গেছে মহাত্মাজী হাঁটুর ওপর কাপড় পরে একটি ইউরোপীয় মহিলার হাত ধরে নৃত্য করছেন। চিত্র প্রদর্শনীতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে সব ছবি দেখানো হয়েছে সেখানে স্থান পেয়েছে কুৎসিৎ কদাকার বুভুক্ষাপীড়িত কঙ্কালের ছবি, কোথাও বা সহমরণের বিবরণ, কোথাও বা বাল্যবিবাহের নগ্নতম রটনা ইত্যাদি। এই সব ছবি প্রদর্শনের উদ্দেশ্য এই যে ইংরাজ আমাদের এই সব অনাচারের হাত থেকে রক্ষা করেছে, সভ্য করেছে, মানুষ করেছে—সেই দিক থেকে তারা আমাদের ধন্যবাদার্হ!

ইউরোপে তখন ফ্যাসিজম আর কমিউনিজমের জের চলেছে। প্রত্যেক রাজ্যেই এই দুই দল গড়ে উঠেছে, কম আর বেশী। সুভাষবাবুরও এদের সঙ্গে মিশে মিশে এই দুই দলের দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চয এই যে বাস্তবিকপক্ষে তিনি পুরোপুরিভাবে কোন বিশেষ দলের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন নি। উপরন্তু তিনি এই দুই মতবাদের সারাংশ—ভাল অংশগুলোর সামঞ্জস্য করে একটা নিজস্ব ও উদার মতবাদ সৃষ্টি করেছিলেন। এই মতবাদের নাম সমবাদীয় মতবাদ। এই মতবাদকে কেন্দ্র করে তিনি যে দল গঠন করার পরিকল্পনা করেছিলেন সেই দলের নাম সমবাদীয় সঙ্ঘ। লণ্ডনে আহুত নিখিল-ভারত সর্বদলীয় অধিবেশনে আমন্ত্রিত হয়ে সেখানেই প্রথম তার এই নব পরিকল্পিত

সঙ্ঘের উদ্দেশ্য প্রচার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লণ্ডনে প্রবেশ করবার অনুমতি না পাওয়ায় তাঁর অভিভাষণ ডাঃ ভাট পাঠ করে শোনান।

এই সময়ে ভারতবর্ষে পণ্ডিত জওহরলাল কংগ্রেসের বৈদেশিক নীতি প্রচারের ওপর জোর দিচ্ছিলেন। বোধ হয় সুভাষবাবুর ইউরোপের জনপ্রিয়তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার উদ্দেশ্য কিছুটা প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল এর পেছনে। যাই হোক একদিকে যেমন সুভাষবাবু ফ্যাসিজমকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ না করে এবং কমিউনিজমকে অনেকক্ষেত্রে নিন্দা করে নতুন ধরণের মতবাদ গড়ে তুলছিলেন এবং জগৎ সমক্ষে প্রচার করবার চেষ্টা করছিলেন, অপর দিকে তেমনি জওহরলাল বিশেষ করে নাৎসীবাদ ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে নিন্দা করে কমিউনিজমকে বিশেষভাবে গ্রহণ করবার ও অনুসরণ করবার নির্দেশ দিয়ে কংগ্রেসের বৈদেশিক নীতি প্রচার করতে তৎপর হয়ে উঠলেন। অবশ্য সুভাষবাবু নাৎসী ফ্যাসি বা সাম্রাজ্য কোন 'বাদ'কেই গ্রহণ করেন নি কিন্তু তেমনি আবার কমিউনিজমকে ভীষণ আক্রমণ করেছেন।

জওহরলালজী লিখলেন, আমি জোরের সঙ্গে বিশ্বাস করি যে জগতের মূল সমস্যা হয় কমিউনিজম নয় ফ্যাসিজমকে গ্রহণ করা এবং আমি সর্বতোভাবে কমিউনিজমের পক্ষপাতী। আমি ফ্যাসিজম সম্পূর্ণ অপছন্দ করি···কারণ ফ্যাসিজম পরোক্ষভাবে সেই ধনিকতন্ত্রের স্বার্থসিদ্ধির একটা ঘোরালো উপায় মাত্র। ফ্যাসিজম ও কমিউনিজমের মধ্যে কোন মধ্য পন্থা নেই। দু'টোর মধ্যে একটাকে বেছে নিতে হবে এবং আমি কমিউনিষ্ট আদর্শকেই নেবো ইত্যাদি।

সুভাষবাবু জবাব দিলেন,—এইখানে লেখক যে মন্তব্য করেছেন তা আগাগোড়াই ভ্রমাত্মক। আমরা যতক্ষণ না বিবর্তনের শেষ পরিণতি পর্যন্ত অপেক্ষা করছি —অবশ্য বিবর্তনবাদকে একেবারেই বরবাদ যদি না করা হয়—তাহলে এই দু'টোর মধ্যেই আমাদের পছন্দ সীমাবদ্ধ ক'রে রাখবার কোন যুক্তি নেই। এমন দিন আসছে যেদিন জগতের ইতিহাসে কমিউনিজম ও ফ্যাসিজমের একটা মিশ্রনের

সূত্রপাত হবে। আর ভারতেই যদি তার প্রথম সূত্রপাত হয় তাহলে আশ্চয হবার কিছু আছে কি ?...জগৎ গান্ধীবাদের মত একটা নূতন পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে যদি এত উৎসাহিত হয়ে উঠতে পারে তাহলে সারা জগতের পক্ষে প্রয়োজনীয় আর একটি পরীক্ষা ভারতে সুরু হবে তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে ?

শুধু ব্যক্তিগত বাদানুবাদের উপর জোর না দিয়ে দুজনের বক্তব্য ও মতবাদেব ওপর এখন জোর দেওয়া উচিত। অবশ্য জওহরলালজী যখন বলছেন যে কমিউনিজম মতবাদের উপর তিনি যথেষ্ট আস্থাবান (সম্পূর্ণ নয়) তখন সেদিকটা আলোচনা করবাব বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু সুভাষবাবুর মতবাদ সম্পূর্ণ অভিনব। তাই তাব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের সঠিক ধারণা থাকা দরকাব। যথা :—

(১) এই দল কিষাণ, মজুর প্রভৃতিদের স্বার্থ রক্ষা করবে অর্থাৎ জমিদার, বণিক এবং মহাজন শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থের জন্যে নয়।

(২) এই দল ভারতের জনসাধারণের সম্পূর্ণ অর্থ নৈতিক ও রাজ নৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করবে।

(৩) ভারতের শেষ লক্ষ্য ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট হিসাবে এই দল সংগ্রাম চালাবে তবে ভারতকে নিজের শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে কয়েক বছরের মেয়াদে একজন ডিক্টেটরের অধীনে এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনের ওপর বিশ্বাস রাখবে।

(৪) দেশের শিল্প ও কৃষি জীবনের পূর্ণ সংস্কার সাধনের নিমিত্ত সুচিন্তিত পরিকল্পনার ওপর জোর দেবে।

(৫) বিগত যুগের পঞ্চায়েৎ পরিচালিত গ্রাম্য সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিতে নতুন ধরণের সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা ও জাতিভেদ ও অন্যান্য সামাজিক বিধি নিষেধের উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টায় রত থাকবে।

(৬) আধুনিক জগতের গবেষণা মূলক ও কার্যকরী পদ্ধতি অনুযায়ী আধুনিক ধরণের মুদ্রা ও ঋণ ব্যবস্থাব প্রবর্তনের চেষ্টা করবে।

(৭) জমিদারী প্রথা বদ ও সমান হারের ভিত্তিতে জমিকর ব্যবস্থার চেষ্টা করবে।

(৮) গণতন্ত্র বলতে মধ্য ভিক্টোরিয়ান যুগের গণতন্ত্রের ওপর বিশ্বাস রাখবে না, কিন্তু ভবিষ্যতে ভারত যখন নিজের প্রতিষ্ঠার ওপর স্বাধীনভাবে অধিষ্ঠিত হবে তখন একটা অন্তর্বিপ্লবের সৃষ্টি না হয়ে ভারত যাতে ঐক্যবদ্ধ থাকে তাব জন্যে সামরিক শৃঙ্খলা প্রাপ্ত একটিমাত্র শক্তিশালী দলের ওপর শাসন ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ায় বিশ্বাস রাখবে।

(৯) শুধু ভারতেব মধ্যে নিবদ্ধ রেখে নয়, এই দল ভারতেব মুক্তি প্রশ্নকে আরও প্রাধান্য দেবাব জন্যে আন্তর্জাতিক প্রচারকার্যেরও আশ্রয় নেবে এবং বর্তমানের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে।

(১০) এরা সমস্ত অগ্রগামী দলগুলিকে এক জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অধীনে সঙ্ঘবদ্ধ করবার চেষ্টা করবে যাতে যখনই কোন কাযকরী পন্থা গ্রহণ করা হবে তখন একই সঙ্গে সব ক্ষেত্রে সকল দিক থেকে কাজ স্বরু হয়ে যেতে পারে।

এইবার ভারতের দিকে একবার চোখ ফেরানো যাক। একদিকে যেমন ইউরোপ থেকে সুভাষবাবুর বক্তৃতা, ভাষণ, লেখা, প্রচার পত্র প্রভৃতি আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ছে দেশের খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়—মানুষ সমস্ত প্রাণের আগ্রহ নিয়ে শুনছে জগতে নতুন এক আদর্শ নতুন এক মতবাদের পূর্ব স্মচনা অন্যদিকে তেমনি দেশের মধ্যে থেকে জওহরলালজী সোশ্যালিজম ও কমিউনিজমকে সমর্থন করে আর ফ্যাসিজমকে নিন্দা করে বক্তৃতা দিচ্ছেন, লোককে আকর্ষণ করছেন এবং কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট পার্টিকে শক্তিমান করে তুলছেন। সুভাষবাবুর অবর্তমানে জওহরলালেই ভারতের তরুণ সম্প্রদায়ের, অগ্রগামী সম্প্রদায়ের

একমাত্র কর্ণধার! তাহলে গান্ধীজীর প্রভাব কি একেবারেই খর্ব হয়ে গেল? না, কথাটা অত সহজেই উড়িয়ে দেবার মত নয়।

গান্ধীজী প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসের সংশ্রব ত্যাগ করলেও সবার পশ্চাতে ধ্রুবতারকার মত উজ্জল ও একদর্শী হয়ে পথ নির্দেশ করছেন। তাঁর তিনটি প্রধান সহায় সর্দার প্যাটেল, মৌলানা আজাদ এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদ! সর্দার প্যাটেল কংগ্রেসের সভাপতি এবং সর্বেসবা—প্রকৃতপক্ষে ডিমোক্রাসীর পরিবর্তে কংগ্রেস প্যাটেলের ডিক্টেটরশিপ বা একাধিপত্যের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। সেদিক থেকে প্যাটলের জনসাধারণকে চালনা করবার ও তাদের ওপর কর্তৃত্ব করার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে এ কথা সকলেই স্বীকার করবে। কংগ্রেসের অবস্থা তখন অনেকটা জার্মানীর নাৎসী পার্টির মতই। এখানেও ডিক্টেটরশিপের পূবাভাষ দেখা দিচ্ছে। মুখে গণতন্ত্রের বুলি আওড়ালেও কার্যতঃ কংগ্রেসের ক্রিয়াকলাপ বিপরীত দিকে চলতে বসেছে। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে সুভাষবাবুকে ফ্যাসিষ্টপন্থী বলে তাঁর মতবাদকে যে ডিক্টেটরশিপের জয়গান বলে কংগ্রেস মিথ্যা আক্রমণ করবার চেষ্টা করছে কংগ্রেস অপর দিকে পরোক্ষভাবে সেই ডিক্টেটরশিপের দিকেই এগিয়ে চলেছে।

গান্ধী-অনুপ্রাণিত কংগ্রেসের এই দলীয় প্রভাব খুব শক্তিশালী হয়ে উঠলেও কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট পার্টি বা সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেস দলের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা একেবারে অগ্রাহ্য করবার মত নয়। সুভাষবাবু যদিও সকল বিষয়ে এদের সঙ্গে একমত ছিলেন না তবু তিনি লিখেছিলেন, বর্তমানে সমাজ তান্ত্রিক দল যে পন্থা অবলম্বন করছে তাতে তারা বিশেষ অগ্রসর হতে পারবে না। দলের সংগঠন বিসদৃশ উপদানের সংমিশ্রন মাত্র এবং কয়েকটা মত আবার একালের উপযুক্ত নয়। কিন্তু এই দল গঠনের মূলে আছে যে প্রেরণা তা সম্পূর্ণ যুক্তি সঙ্গত। এই বামপন্থী দল থেকেই পরিশেষে এমন একটি নতুন পূর্ণবিকশিত দল বেরিয়ে আসবে যার স্পষ্ট আদর্শ এবং নির্দিষ্ট কর্মসূচী ও পদ্ধতি জানা আছে।...তবে তাদের

সাহায্য করবার মত অনেক লোকের সাহচর্য থেকে তারা এখন বঞ্চিত। যখন তাদের সাহচর্য তারা পাবে তখন তারা আরও প্রবল ভাবে অগ্রসর হতে পারবে।

পরবর্তীকালে, সুভাষবাবু সম্পূর্ণ মুক্তি পাবার পর (১৯৩৭) থেকে এই সমাজ তান্ত্রিক দল আদর্শের দিক থেকে অনেক বিষয়ে পরস্পর বিরোধী হলেও সুভাষবাবুর সঙ্গে সাহচর্য বজায় রেখে চলেছিল। বস্তুত পক্ষে এই সমাজতান্ত্রিক দলের নেতারা—যথা, জয়প্রকাশ নারায়ণ, নরেন্দ্র দত্ত প্রভৃতি—কখনও সুভাষবাবু আবার কখনও জওহরলালের পথ অনুসরণ করে আসছেন।

দেখা যাচ্ছে সুভাষবাবু কংগ্রেস হাই কমাণ্ডকে যতদূর আক্রমণ করেছেন তার তুলনায় সমাজতান্ত্রিক দলকে একটু যেন সমর্থনই করে আসছিলেন। কিন্তু কমিউনিজমের বিরুদ্ধে তিনি রীতিমত বিষোদ্গার করে এসেছেন। তিনি যুক্তির পর যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন কেন কমিউনিজম আমাদের দেশে চলতে পাবে না। যথা—(১) কমিউনিজমের মধ্যে জাতীয়তাবাদের সমর্থন নেই। অথচ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধেব আদর্শ জাতীয়তাবাদ। (২) বর্তমান সময়ে রাশিয়ার সর্বদেশীয় বিপ্লবের কোন চেষ্টা নেই বরং সে ধনতন্ত্রবাদ রাজ্যদের সঙ্গে চুক্তি করছে আদান প্রদান করছে। (৩) ভারতবর্ষে ধর্মের সঙ্গে বিরোধিতা অসম্ভব। রাশিয়ায় অধার্মিকতা ও নাস্তিকতা যে রকম বিস্তার লাভ করছে ভারতবর্ষে সেরকমটা আশা করা যুক্তি সঙ্গত নয়। (৪) যদিও এক শ্রেণীর লোক ভারতে কমিউনিষ্ট প্রচারিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর বিশ্বাস করবে তবু আর সকলে এমন কি এই শ্রেণীর লোকেরাও বস্তুতন্ত্রবাদকে সমর্থন করতে পারবে না। (৫) যদিও পরিকল্পনাদি অর্থনৈতিক ব্যাপারে কমিউনিজম যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছে তবু মুদ্রা সংক্রান্ত বিষয়ে তা মোটেই কোন নতুন পথের ইঙ্গিত দিতে পারে নি যাতে এ বিষয়ে সুব্যবস্থা হতে পারে।

সুভাষবাবুর কমিউনিজমের বিরুদ্ধে এই সব মতামতের ফলে ইং ১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের অধিবেশনে কমিনটার্ণ সমস্ত জগতের কমিউনিষ্ট দলদের

এই জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধাচরণ করতে আদেশ দেয়। এর ফলে কংগ্রেসের মধ্যেও কমিউনিষ্টদের ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া সুরু হয়। কিন্তু, সে কথা বর্তমানে অবান্তর।

সুভাষবাবুর ইউরোপে থাকাকালীন তাঁর জীবনে দুটি দুর্যোগ ঘটে। প্রথম হল তাঁর প্রবাসজীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও সহায়ক বিঠলভাই প্যাটেলের পরলোক গমন। গোড়া থেকেই তাঁর শরীর অসুস্থ ছিল তারপর ১৯৩৩ সালের মাঝামাঝি তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃতদেহ ভারতে পাঠানো হয়। সুভাষবাবু মার্সেল্‌স্ বন্দর পর্যন্ত মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন।

দ্বিতীয় দুর্যোগ সুভাষবাবুর পিতৃবিয়োগ। অসুখের সংবাদ পেয়েই তিনি কোলকাতা যাত্রা করলেন। ঠিক যেদিন তিনি এসে পৌছলেন সেদিনই তাঁর বাবা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। তিনি তাঁর বাবার শেষকৃত্যে যোগ দিতে পেরেছিলেন শেষ পর্যন্ত। শ্রাদ্ধাদি করবার জন্যে তিনি একমাস এখানে থাকবার অনুমতি চেয়েছিলেন কিন্তু এক সপ্তাহের বেশী তাঁকে থাকতে দেওয়া হোল না। তাও এই সাতদিন কড়া পুলিশ নজরে তাকে থাকতে হয়েছিল। তবু তিনি লিখেছিলেন, 'বিদেশে স্বাধীনভাবে বিচরণ করার চেয়ে দেশে আবদ্ধ থাকা অনেক ভাল।' কিন্তু তবু তাঁকে রাখা হল না। যাবার আগে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলে গেলেন, দেশে এখন রাজনৈতিক পঙ্কিলতা চলছে, আমাদের সমস্যা এখন জনসাধারণের মনে অনুপ্রেরণা চির জাগ্রত রাখা।

কোলকাতা থেকে ফিরে তিনি রোমে কিছুদিন ছিলেন। এই রোমে থাকবার সময় তাঁর মনের মধ্যে আবার একটা পরিবর্তন আসে, আবার একটা প্রচণ্ড শক্তির উৎসদ্বার খুলে যায়। তিনি রোমে মুসোলিনীর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর কর্মপদ্ধতি, শৃঙ্খলা ও শাসন ব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ হন! মুসোলিনীর রোম সাম্রাজ্যের স্বপ্ন ইটালীর তরুণ সম্প্রদায়ের মনে দোলা জাগিয়েছিল। তরুণের সম্রাট সুভাষচন্দ্র এই বিরাট পরিকল্পনায় যে অভিভূত হবেন তাতে আশ্চর্য হবার

কিছু নেই। তবে এর কারণ সাম্রাজ্যলিপ্সা নয়,—এই একটি জাতি সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যে মাথা তুলে দাঁড়াবার কল্পনা করে—বৃটেনের স্বভাবশত্রু সুভাষচন্দ্র তাতে উৎসাহিত বোধ না করে পারেন কি? তিনি কল্পনা করতেন তাঁর নিজের দেশের তরুণের দল এমনি ভাবে সামরিক শিক্ষা পাবে, শক্তি সঞ্চয় করবে, এগিয়ে যাবে। যেখানে বীর্য আর শৌর্যের প্রশ্ন সেখানেই বীর নেতা সুভাষচন্দ্রের মন আকৃষ্ট, অভিভূত।

রোমে থাকতে আফগানিস্থানের দেশপ্রেমিক রাজা আমানুল্লার সাথে সুভাষবাবুর পরিচয় হয়। আমানুল্লা ভারতের কংগ্রেস-আন্দোলন ব্যাপারে অত্যন্ত সহৃদয়তা ও উৎসাহের সঙ্গে সুভাষবাবুর সঙ্গে আলাপ করেন। সুভাষবাবু আমানুল্লার সঙ্গে মিশে যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছিলেন।

এদিকে ১৯৩৬ সালের কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনের দিন এগিয়ে আসছে। নির্বাচিত-সভাপতি জওহরলাল নেহরু সুভাষবাবুকে এই অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে আমন্ত্রণ জানালেন। সুভাষবাবুরও খুব ইচ্ছা ছিল ভারতে ফিরবার। কিন্তু ভারত সরকার জানিয়ে পাঠালেন যে সুভাষবাবু ভারতে পদার্পণ করলেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে।

সুভাষবাবুর সম্মুখে দুটি প্রশ্ন, এক, দেশের ডাকে সাড়া না দিয়ে শাসকের অন্যায় হুমকী মাথা নীচু করে মেনে নেওয়া আর দুই, দেশের ডাকে সাড়া দিয়ে কারাবরণ করা।

এই দ্বিতীয় পথে পা বাড়াতে তিনি একটুও দ্বিধা করলেন না। এবং যাবার আগে এই বিষয়ে ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডেন পত্রিকায় এক জোরালো প্রবন্ধ লিখলেন।

এগারোই এপ্রিল ১৯৩৬। হাজারে হাজারে নরনারী এসে সমবেত হয়েছে সমুদ্র সৈকতে তাদের প্রাণপ্রিয় নেতাকে সম্বর্ধনা জানাতে। কিন্তু মাটিতে

পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে সুভাষবাবু গ্রেপ্তার হলেন। বৃটিশ আর যাই হোক সাধারণ ভদ্রতা জ্ঞান তার আছে, সে কথা রাখতে জানে।

বহুদিনের অনশনক্লিষ্ট আর্তের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে গেল নির্লজ্জ বঞ্চক।

যাবার আগে, বহু দুর্যোগের পরে প্রথম সূর্যালোকের মত তাঁর বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠলো—Keep the flag of freedom flying!—স্বাধীনতার ধ্বজা চির-উড্ডীন করে রাখো।

সে রক্তের ডাকে রক্তিম হয়ে উঠলো ভারতের হৃদয়-আকাশ!

সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বৃটিশের বর্বর আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের তুফান তুললো। সেই ঝড়ের ছোঁওয়া গিয়ে পৌছলো হাউস অব কমন্‌সে পর্যন্ত! ভারত-সচিব বললেন সুভাষচন্দ্র হিংস-আন্দোলনের সহিত যুক্ত আছেন।

কিন্তু, কোন-অজুহাত টিকলো না। শেষ পর্যন্ত সরকার পক্ষ ১৯৩৭ সালে সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলেন।

কারামুক্তির পর কিছুদিন কোলকাতায় থাকবার পর স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তিনি কিছুদিন ডালহৌসীতে গিয়ে রইলেন। এরপর কিছুদিনের জন্যে তিনি আবার ইউরোপ যাত্রা করলেন। লণ্ডনে তাঁকে বিরাট এক সম্বর্ধনা-সভায় অভিনন্দিত করা হল। তিনি ইউরোপের চারদিকে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। বক্তৃতার উদ্দেশ্য ১৯৩৭ সালের শাসন সংস্কারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ চালানো।

কংগ্রেসের সিংহাসনে

আগেই দেখা গেছে যে সুভাষবাবু যখন ইউরোপে ছিলেন তখন ধীরে ধীরে গান্ধীজীর প্রভাব আবার বিস্তার লাভ করছে। অবশ্য গান্ধীজী প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন এবং কার্যতঃ কংগ্রেসের কর্ণধারস্বরূপ হয়ে দাড়িয়েছেন আজাদ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও প্যাটেল। জন্ গান্থার এঁদের নাম দিয়েছিলেন—Zonal chieftains. এই তিনজন নেতা কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের কার্যভার তিনভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন। তাছাড়া কংগ্রেস তখন প্রাদেশিক মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছে এবং যারা প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করছেন তারা সকলেই গান্ধীবাদের ওপর বিশ্বাস করেন। এমন কি গান্ধীজী আদেশ দিলে তাঁরা তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছেন। এদিকে সোশ্যালিষ্ট দলও তাদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের সঙ্গে যোগ দিয়ে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে চেষ্টা করছে। তার কারণ সুভাষবাবুর অনুপস্থিতি। জওহরলাল ইতিমধ্যেই গান্ধীজীর কাছে আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছেন, জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং নরেন্দ্র দত্ত কাজ করলেও সমস্ত ভারতবর্ষে একটা দল চালাবার মত সুযোগ সুবিধা অর্জন করতে পারেন নি। তাই সুভাষবাবু দ্বিতীয় বার ইউরোপ যাবার আগে যে কয়দিন এখানে ছিলেন তার মধ্যেই এই সোশ্যালিষ্ট দলের নেতা হয়ে দাঁড়ালেন। অবশ্য সোশ্যালিষ্ট দলের মধ্যে যে পরিবর্তনের পূর্বাভাষ দেখা যাচ্ছিল তিনি সেটা পছন্দ করতে পারেন নি। তাই তাঁর কর্মপন্থার দুটো বিভিন্ন দিক স্পষ্ট হয়ে উঠলো! এক: কংগ্রেস হাই-কমাণ্ড যাতে বৃটিশ প্রস্তাবিত ফেডারেশনে সম্মতি না দিয়ে বসে এবং দুই: সমস্ত বামপন্থীদের পক্ষ থেকে কংগ্রেসের অধীনে সমস্ত কিষাণ—মজুরদের স্বার্থ রক্ষা করা।

এদিকে আন্দামানের রাজবন্দীদের অনশন-ধর্মঘট আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল এই সময়ে। জনসাধারণ আশা করছিল কংগ্রেস এইবার বিরাট এক আন্দোলন চালিয়ে গভর্ণমেণ্টকে হার মানাতে বাধ্য করবে। পরিণামে হয়ত তাই হত কিন্তু কেন জানি না কংগ্রেস ব্যাপারটা অত্যন্ত দেরী করে ফেলছিল। তাতে জনসাধারণ যে ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই সময়ে তাই সুভাষবাবুর মত বিপ্লবী নেতার প্রয়োজন খুবই অনুভূত হয়েছিল। এবং সুভাষবাবু এই সময়ে অত্যন্ত সহজে এবং অত্যন্ত বেশীরকমের জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন।

কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্যে তাঁকে আবার ইউরোপ যেতে হল কিছুদিনের জন্য, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। এবং ইউরোপে গিয়ে তিনি আবার ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবীর প্রশ্ন নিয়ে বক্তৃতা ও প্রচারকার্য সুরু করে দিলেন। তখন কংগ্রেসের এই ত্রয়ী নেতার দল ভাল ভাবেই উপলব্ধি করতে পারলেন যে আর তাঁকে অবহেলা করা যাবে না। যে কোন উপায়েই হোক তাঁর সঙ্গে মিটমাট করে ফেলা দরকার। কংগ্রেসের মনোভাবের বিরুদ্ধে এই তীব্র বক্তৃতা, এ সমস্তই একেবারে চেপে গিয়ে তাঁরা স্বেচ্ছায় সুভাষবাবুকে কংগ্রেসের শ্রেষ্ঠ সম্মান দেবার জন্যে আমন্ত্রণ পাঠালেন। প্রস্তাবিত আজাদ, জওহরলাল ও গফুর খাঁর নাম বর্জন করে সুভাষবাবুকেই ১৯৩৮ সালের কংগ্রেস সভাপতির পদ দেওয়া হল। তাঁর স্বাস্থ্য খুব ভাল না থাকালেও ১৪ই জানুয়ারী ১৯৩৮ সালে তিনি বিমানপথে দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। করাচী বিমান ঘাঁটিতে তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জানানো হল। মহাত্মাজী থেকে আরম্ভ করে সমস্ত নেতা তাঁকে অভিনন্দিত করলেন।

তাপ্তী নদীর ধারে হরিপুরায় নব নির্মিত কংগ্রেস নগর—বিঠলনগরে কংগ্রেসের অধিবেশন সুরু হল। কংগ্রেসের এই একান্নতম অধিবেশনে কংগ্রেস

অধিবেশন মণ্ডপে ৫১টি তোরণ তৈরী হল, মণ্ডপের উন্নত-শীর্ষে উড়তে লাগলো ৫১টি জাতীয় পতাকা, ৫১টি জাতীয় সঙ্গীতে মুখর হয়ে উঠলো আকাশ বাতাস, আর ৫১টি বলদবাহিত রথে এলেন ভারতের মুকুটহীন সম্রাট দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসু. আর এই বিরাট শোভাযাত্রার সম্মুখে রইলেন সুভাষচন্দ্রের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। সব জড়িয়ে সে এক অপূর্ব পরিবেশ! বিশেষ করে সভাপতির শোভাযাত্রা নাকি এতই অপূর্ব হয়েছিল যে অনেকের মতে কংগ্রেসের ইতিহাসে এত বড় শোভাযাত্রা সে-পর্যন্ত হয় নি।

বিঠল নগরের চারদিকে নেতাদের কুটির। বিশেষ করে সুভাষচন্দ্র ও জওহরলালজীর কুঞ্জের চারপাশে দর্শনব্যাকুল তরুণ সম্প্রদায়ের ভীড়। তাছাড়া প্রত্যেক ঘরে ঘরে নেতাদের, বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিদের, মন্ত্রিদের এবং দর্শক ও সাংবাদিকদের, ঘরোয়া বৈঠক বসে গেছে। নানারকম আলোচনা চলছে। এবারের কংগ্রেস অধিবেশন সত্যিই নানা দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ বামপন্থী নেতা সুভাষচন্দ্র এবার সর্ববাদি সম্মত সভাপতি। তার ওপর ইউরোপের যুদ্ধ ক্রমশ দ্রুত ঘনিয়ে আসছে তার প্রভাব সম্বন্ধেও একটা কিছু সঠিক ধারণা হওয়া প্রয়োজন। সর্বোপরি রাজবন্দীদের মুক্তি প্রশ্ন নিয়ে বিহার এবং যুক্তপ্রদেশের শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও গোবিন্দ বল্লভ পন্থের মন্ত্রীমণ্ডলী যে পদত্যাগ করেছেন সেটাও একটা বড় বিবেচ্য বিষয়। বামপন্থীদল চেষ্টা করছে যাতে উক্ত দুই নেতাদের মত অন্যান্য প্রদেশের প্রধান মন্ত্রীরাও অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করেন এবং সরকারের নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ তোলেন।

সুভাষচন্দ্র ১৩ই ফেব্রুয়ারী এসে পৌছেছিলেন। ১৪ই তারিখে ওয়ার্কিং কমিটি বা কার্যকরী সমিতির অধিবেশন বসলো। ১৬ তারিখে বিদায়ী সভাপতি জওহরলাল নেহরু সুভাষবাবুর হস্তে কংগ্রেসের সভাপতিত্বের গুরুদায়িত্ব তুলে দিলেন। সেদিন কি কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল যে এক বছর পরেই এই

একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিককে অপমান করে বের করে দিতে হবে ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান—কংগ্রেসের থেকে ?

এবং তারপর এই লাঞ্ছিত সূর্য কোন মহাদুর্যোগের সাগরপার থেকে সমস্ত জগতের সামনে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র নেতারূপে আবার ভাস্বর হয়ে উঠবে। কোন দলগত সভাপতিত্বের হাত বদল নয়—কোন মিটিং করে নেতৃত্ব গ্রহণ নয়—প্রতি ভারতবাসীর মনে স্বতঃস্ফূর্ত চেতনার মত একটি নাম উজ্জল হয়ে উঠবে—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু! তুচ্ছ ৫১ নয়—শুধু ৫১ কেন লক্ষ বলদ-বাহিত রথেও নয়—কোটি কোটি ভারতবাসীর জাগ্রত দেশপ্রেমের উচ্ছসিত ফল্গুধারায় বাহিত—প্রবাহিত হয়ে ফিরবে এই নাম হিমালয় থেকে কুমারীকা পর্যন্ত!

বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে দাঁড়িয়ে ১৯শে ফেব্রুয়ারী সুভাষবাবু বিঠলনগরের বুকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন। দিকে দিকে জয়ধ্বনি উঠলো— 'বঙ্গ-কেশরী কি—জয়'। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি দরবার গোপাল দাস এবং সর্দার প্যাটেল সুভাষবাবুকে অভ্যর্থনা জানালেন। গোপাল দাস এই মর্মে খুব সুন্দর একটি বক্তৃতা দিয়ে সুভাষবাবুর অসীম ত্যাগ ও অসাধারণ দেশপ্রেমের ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

সভাপতি হিসেবে সুভাষবাবুর সেদিনকার অভিভাষণ বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েছিল। তাঁর বক্তৃতার মধ্যে তাঁর নতুন মতবাদের কোন ইঙ্গিত ছিল না এমন কি গান্ধীবাদের পরিবর্তে কোন নতুন দলের উদ্ভবের কোনও সম্ভাবনার কথাও তিনি বলেন নি। কেন না তিনি অনুভব করেছিলেন যে কংগ্রেসের মধ্যে স্পষ্টতঃ কোন রকম দলাদলি করার সময় এখন নয়। তিনি যখন কংগ্রেসের সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করেছেন তখন ধীরে ধীরে তাঁর মতবাদকে কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করাই যুক্তিযুক্ত, মৌখিক ঝগড়া-বিবাদের মধ্য দিয়ে নয়।

প্রথমেই ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদকে নিন্দা করে তিনি তাঁর বক্তৃতার উদ্বোধন

করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, ইংরাজের এই বিরাট সাম্রাজ্য ধ্বংসের মুখে চলেছে। সমগ্র ইংরাজ জাতির মুক্তির পথ সমাজতন্ত্রবাদের ওপর নিভর করছে এবং সমাজতন্ত্রবাদ গ্রহণ করতে গেলে সমস্ত সাম্রাজ্যকে স্বাধীনতা দান করতে হবে। ইংরাজের ভবিষ্যৎ, ইতিহাসের অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী জাতিসমূহের ভবিষ্যতেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। পরিত্রাণের পথ নেই।·····ভারতকেও তার জগতের মধ্যে প্রকৃত আসন গ্রহণ করবার ক্ষমতা দিতে হবে। সে ক্ষমতা বর্তমানের অবস্থার মধ্যে সম্ভব নয়। সে ক্ষমতা আমাদের অর্জন করে নিতে হবে। ভারতের বিপুল জনসাধারণের মধ্যে বিরাট এই জাগ্রত অনুপ্রেরণা ও দেশপ্রেমকে সুনির্দিষ্ট পথের মধ্য দিয়ে পরিচালিত করতে হবে। কিন্তু আমাদের কি এর জন্যে প্রকৃত-শিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী আছে? তাদের উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত করে তোলবার মত নেতা আছে কি? কেন নেই? কেন আমাদের তরুণ নেতাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা নেই? এই ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। আধুনিক জগতের রাজনৈতিক দলের যে সমস্ত প্রয়োজন আছে আমাদেরও সেই সব ব্যবস্থা থাকা দরকার। জগতের সমস্ত দেশে তরুণদের এই জাতীয় শিক্ষা দেওয়ার যে ব্যবস্থা আছে আমাদেরও সেই ব্যবস্থা করতে হবে। সেদিক দিয়ে জার্মাণীর কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি।

ইউরোপে থাকতে তিনি একটি মাত্র দলের সার্বভৌম কর্তৃত্বের ওপর জোর দিতেন কিন্তু হরিপুরায় তিনি ভিন্ন মত প্রকাশ করলেন। তিনি বলেন, স্বাধীনতা লাভ করবার পরও কংগ্রেসের অস্তিত্বের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। তখন কংগ্রেসকে শাসনভার এবং সংস্কার ও পুনর্গঠনের ভার গ্রহণ করতে হবে। যুদ্ধোত্তর ইউরোপে আমরা দেখছি যে, যে দেশে রাজনৈতিক দল বা পার্টি দেশের শাসনভার ও পুনর্গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে সে দেশেই শৃঙ্খলা এবং ক্রমোন্নতি দেখা যাচ্ছে। তবে এইরকম একটি দলের কর্তৃত্বের ফলে দেশের মধ্যে একটি মাত্র দলেরই একাধিপত্য গড়ে ওঠে যেমন জার্মানীতে নাৎসী দলের ব্যাপারে দেখ

যাচ্ছে। কিন্তু আমার মতে একটি দলের উপর দায়িত্ব থাকলেও অন্যান্য দলেরও অস্তিত্বের সমান দাবী আছে, তাহলেই প্রকৃত গণতন্ত্রের ভিত্তিতে কাজ চালানো যেতে পারে। উপরন্তু গণতন্ত্রের ফলে দেশের সর্বনিম্ন সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে নেতৃনির্বাচন চলতে পারে সমাজের শুধু উপরের স্তর থেকে নয়।...কংগ্রেসের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক দলের উদ্ভব নিয়ে খুব বাদানুবাদ চলছে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে এই দলের সভ্য নই তবে একথা বলা ভাল যে গোড়া থেকেই এর মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমার সমর্থন আছে। আপনারা একে কোন দল বলুন, পার্টি বলুন, লীগ বলুন, আর গ্রুপই বলুন আমার মতে সমস্ত বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কংগ্রেসের পতাকা তলে কংগ্রেসের অনুশাসনের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ করা উচিৎ—সে অধিকার তাদের আছে।...সমাজতন্ত্রবাদই আমাদের সম্মুখ সমস্যা নয়—দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশকে সমাজতন্ত্রবাদ অনুযায়ী পরিচালনা করবার জন্যে এখন থেকেই খানিকটা প্রচারকার্য করা মাত্র।

দেখা যাচ্ছে সোশ্যালিষ্ট দলকেও তিনি সমর্থন করছেন অথচ কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন করে নয়। তাঁর নিজস্ব মতবাদ একটি মাত্র দলের কর্তৃত্ব সম্বন্ধেও যেমন তিনি জোর দেন নি তেমনি আবার কংগ্রেসের মধ্যে বহু দলের ঐক্যের ব্যাপারেও তিনি উদাসীন ন'ন। এমন কি সর্বশেষে তিনি গান্ধীজীকে যেভাবে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানালেন তাতে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। পরিশেষে তিনি বললেন, ভারতবর্ষে এখনও বহুদিন গান্ধীজীর প্রয়োজন আছে। আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ রাখবার জন্যে তাঁকে প্রয়োজন। আমাদের মুক্তি সংগ্রামকে সমস্ত হিংসা ও বিবাদ থেকে মুক্ত রাখবার জন্যে তাঁকে আমাদের প্রয়োজন। ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধের জন্যে তাঁকে আমরা চাই। সর্বোপরি সমস্ত মানবজাতির কল্যাণের জন্য তাঁকে প্রয়োজন। আমাদের সংগ্রাম শুধু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নয় সমগ্র জগতের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে।...ভারতের স্বাধীনতা সমস্ত মানবজাতির রক্ষা কবচ! বন্দেমাতরম্!

দারুণ উৎসাহ উত্তেজনার মধ্য দিয়ে হরিপুরার কংগ্রেস শেষ হয়ে গেল। সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে নতুন জীবনের স্পন্দন জেগে উঠলো তাতে সকলেই বিশেষ উৎসাহিত বোধ করতে লাগলেন। রাজবন্দীরা মুক্তি পাওয়ায় বিহার এবং যুক্ত প্রদেশের মন্ত্রীরা আবার কার্যভার গ্রহণ করলেন। সুভাষবাবু তাঁর অসুস্থ দেহ নিয়েও চারিদিকে বক্তৃতা দিয়ে কংগ্রেসের ভাব প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু সেই পার্লামেণ্টারী বোর্ডের ক্ষমতা একেবারেই খর্ব হয়ে যায় নি। তাঁরা তখনও উগ্রপন্থী নেতাদের কর্তৃত্ব সহ্য করতে পারছিলেন না। তাই গোড়া জাতীয়তাবাদী নরীম্যান ও খারের সঙ্গে তাঁদের মতানৈক্য সুরু হল। আগে হলে সুভাষবাবু এঁদের সমর্থন করে কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করতেন। কিন্তু এখন তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ—যে কোন উপায়ে একটা ঘরোয়া আপোষের চেষ্টা—অবলম্বন করেছেন, তাই তিনি কিছু বলতে পারলেন না। নরীম্যান ও খারে কংগ্রেসের অফিস থেকে বিতাড়িত হলেন। কিন্তু এই সামান্য ঘটনা কতবড় একটা দুর্যোগের পূর্বসূচনার ইঙ্গিত দিয়েছিল তখন কেউ তা সন্দেহ করতে পারে নি।

হরিপুরার পর ত্রিপুরীর অধিবেশন অবিশ্বাস্য হলেও নিষ্ঠুর রকমের সত্য!

এতদিন দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী দলের মধ্যে যে মতানৈক্য চলছিল সেটা সাধারণের মধ্যে খুব বেশী প্রকাশ্য হয়ে ওঠে নি। উপরন্তু সুভাষবাবুর সভাপতিত্বের সময়ে তিনি মিটমাট করবার যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন তার ফলে দুই দলের সম্বন্ধ অনেকটা সহজ হয়ে এসেছিল। তবে একটা প্রশ্ন নিয়ে মনে মনে খুবই মতদ্বৈধ চলছিল তখনও, সেটা হল ফেডারেশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সমর্থন নিয়ে। সুভাষবাবু বরাবরই উগ্রপন্থী, তিনি কোন দিক দিয়েই বৃটিশের সঙ্গে সামান্যতম আপোষেরও পক্ষপাতী ন'ন। এদিকে দক্ষিণ পন্থী আপাততঃ ফেডারেশন ব্যবস্থা মেনে নিতে চায়। দক্ষিণ পন্থী নেতাদের জানা ছিল যে সুভাষবাবু যতদিন

সভাপতি থাকবেন ততদিন তিনি এর বিরুদ্ধে সব রকম উপায়ে বাধা দেবেন। এবং তাঁর সঙ্গে অধিকাংশ প্রদেশই যে যোগ দেবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ বর্তমানে তিনি অভাবনীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। তাই আবার যখন নির্বাচনের সময় এল তাঁরা প্রস্তাবিত সুভাষবাবুর নামের সঙ্গে আরও দুজনের নাম প্রস্তাব করলেন যথা—মৌলানা আজাদ এবং পট্টভী সীতারামীয়া…। মৌলানা আজাদের প্রশ্ন ভিন্ন কিন্তু সীতারামীয়ার নাম সুভাষবাবুর সঙ্গে একই সঙ্গে উঠতে পারে না। তবু তাঁরা জানতেন যে এমন একজনকে সভাপতি করা দরকার যিনি তাঁদের কথা মত চলবেন। আজাদ তাঁর নাম প্রত্যাহার করলেন স্বাস্থ্যের অজুহাত দেখিয়ে। কিন্তু তিনি যে বিবৃতি দিলেন তাতে স্পষ্ট বোঝা গেল যে আসলে ভেতরে ভেতরে একটা কিছু ষড়যন্ত্র চলছে। তিনি বললেন, ডাঃ পট্টভী সীতারামীয়ার নামও প্রস্তাব হয়েছে শুনে আমি খুব আনন্দ বোধ করছি। আমি আমার নাম প্রত্যাহার করবো না মনে করে তিনি তাঁর নাম প্রত্যাহার করতে মনস্থ করেছেন; তবে আমি আনন্দের সঙ্গে বলছি যে আমি তাকে তা না করতে রাজী করেছি। তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বহু পুরাতন সভ্য এবং অক্লান্ত কর্মী। আমি নিবাচনের জন্য তাঁর নাম প্রতিনিধিদের সামনে উপস্থাপিত করছি, এবং আশা করি তিনি সবসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হবেন।

সুভাষবাবু প্রত্যুত্তর দিলেন,—আর কোনরকম বিনয় প্রকাশের অবকাশ নেই। এবার রীতিমত নির্বাচন!…যদি মৌলানা আজাদের মত নেতাদের কথামত লোকে আমার বিরুদ্ধে ভোট দেয় তাহলে আমি অতি সাধারণ বাধ্য কর্মীর মত কংগ্রেসের কাজ করে যাবো।

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ তরুণ সম্প্রদায় ও জাতীয়তাবাদী দল সুভাষবাবুর দিকে আর অপরদিকে মুষ্টিমেয় নেতার দল। কিন্তু এই নেতারা জানতেন ব্যক্তিগত প্রভাবের জোরে সুভাষবাবুর দল কোনও রকম প্রচার কার্য না চালালেও ভারী হয়ে উঠবে। তাই তাঁরা সকলে মিলে এক যুক্ত বিবৃতি বের করে নিজেদের

ব্যক্তিগত প্রভাবে জনসাধারণের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলবার চেষ্টা করলেন। তাঁদের বিবৃতি :—আমরা বিশ্বাস করি ডাঃ পট্টভী কংগ্রেসের সভাপতির পদের জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রাচীনতম সদস্যদের অন্যতম এবং তাঁর জীবন বহুদিনের নিরবচ্ছিন্ন জনসেবায় সমৃদ্ধ। আমরা তাই আগামী নির্বাচনে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের সম্মুখে তাঁর নাম অনুমোদন করছি।

এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করলেন, বল্লভভাই প্যাটেল, আচার্য কৃপালনী, শঙ্কররাও দেও, রাজেন্দ্র প্রসাদ, ভুলাভাই দেশাই ও দৌলতরাম।

এমনকি ডাঃ সীতারামীয়া নিজে এক বিরাট বিবৃতি বের করে নিজেকেই নিজে সমর্থন করলেন। তাঁর বক্তব্য এই যে, আমি বহুদিন কংগ্রেসের সেবা করে আসছি আমার নাম প্রস্তাব তারই স্বীকারোক্তি···ইত্যাদি।

এই দুটি বিবৃতি ছাড়া আরও বহু বিবৃতিতে ও রচনায় সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ভরে উঠতে লাগলো। দেশময় দারুণ উৎকণ্ঠার তরঙ্গ! সুভাষবাবু দেখলেন তাঁর পক্ষেও এইবার কিছু প্রচার কায চালানো দরকার আর না হয়ত নাম প্রত্যাহার করতে হয়। কিন্তু নাম প্রত্যাহার করা তাঁর স্বভাব নয় তাই তিনিও বীরের মত তাঁদের সেই অভিযোগের বিরুদ্ধে প্রচার সুরু করে দিলেন। তাঁর বিবৃতি যা বেরুলো তাকে প্রচার বলা যেতে পারে না। সেটা সত্য ঘটনার সহজ প্রকাশ মাত্র। তিনি জনসমক্ষে প্রকাশ করে দিলেন দক্ষিণপন্থী দলের আসল উদ্দেশ্য কি? তিনি বললেন, এটা অনেকেই বিশ্বাস করেন যে আগামী বছরে কংগ্রেস দক্ষিণপন্থী দলের সহিত বৃটিশের ফেডারাল স্কীম নিয়ে একটা আপোষ মীমাংসার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই দক্ষিণপন্থী দল চাননা একজন বামপন্থী নেতা সভাপতি হয়ে এই বোঝাপড়ার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেন।

এর প্রত্যুত্তরে সর্দার প্যাটেল এক বিবৃতি বের করে সত্য ঘটনাকে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু সফল হলেন না। অনেকটা সেই শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার ব্যাপার।

বাদানুবাদ চলতে লাগলো। কিন্তু এটা কারও বুঝতে বাকী রইল না যে বিশিষ্ট নেতাদের যুক্ত বিবৃতিব সাহায্যে কোন বিশেষ লোককে নির্বাচিত করা শুধু অসম্ভব নয়—অন্যায়। উপরন্তু সুভাষবাবুর যুক্তিমূলক বিবৃতি এবং পক্ষ-পাতিত্ব দোষহীন নিঃস্বার্থ কর্মপ্রচেষ্টা সকলকে মুগ্ধ করছে। সুভাষবাবু বললেন, আমি ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে একথা বলছি না। এ আমি আমার দলগত আদর্শের মর্যাদা রক্ষার জন্যে বলছি। আমার পরিবর্তে আচার্য নরেন্দ্র দেও'র মত একজন ফেডারেশন-বিরোধী বিশিষ্ট কর্মীর নাম প্রস্তাব করা যেতে পারে। আমার নাম উঠেছে বলে আমি অনুতাপ করছি।

তিনি এমন পর্যন্ত বললেন, যে এখনও এই সঙ্ঘর্ষ প্রতিরোধ করার সময় আছে যদি দক্ষিণপন্থীদল তাঁদের মধ্য থেকেই এমন কোন নেতাকে নির্বাচিত করেন যাঁর ওপব বামপন্থীদল সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারে।

কিন্তু দক্ষিণপন্থী এ প্রস্তাবেও কর্ণপাত করলে না।

এর পর সম্মুখ সমর ছাড়া আব গত্যন্তর নেই।

আর হলও তাই! ভোটের ফলাফল বেরোতে দেখা গেল, সুভাষবাবুর পক্ষে ভোট ১৫৮০ আর সীতারামীয়ার পক্ষে ১৩৭৭।

নেহাৎ সামান্য নয় রীতিমত ২০৩ ভোটের তফাৎ!

মুকুটহীন সম্রাট সুভাষচন্দ্র কোন এক অপার্থিব সাম্রাজ্য জয় করে এসে বসলেন সিংহাসনে। পুনর্বার!

এতবড় জয়লাভে সুভাষবাবু এতটুকুও অধীর হয়ে উঠলেন না আনন্দে বা উত্তেজনায়। তিনি স্থির মস্তিষ্কে এই জয়বার্তা গ্রহণ করলেন। বললেন, আনন্দে আত্মহারা হবার সময় এখন নয়। এখন আমাদের দৃষ্টি শুধু আগামী কালের দিকে। আগামী কালের দিকে চেয়ে আমাদের কাজ করতে হবে, ব্রত গ্রহণ করতে হবে। এই প্রতিযোগিতার ফলাফল আমরা মাথা নত করে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে যেন গ্রহণ করতে পারি।···পাছে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের শত্রুরা মনে

করে যে কংগ্রেসে ভাঙ্গন ধরেছে তাই আমি স্পষ্ট করে ঘোষণা করছি যে কংগ্রেস আগের মতই এখনও সঙ্ঘবদ্ধ আছে। কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে কয়েকটা ব্যাপারে মতানৈক্য থাকতে পারে কিন্তু যখনই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রশ্ন ওঠে তখন সকলেই একমত, একতাবদ্ধ!

কোলকাতায় এক সম্বর্ধনা সভায় ঠিক এই কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি। উপরন্তু বললেন, এই জয়লাভের দিনে এমন কোন কথা বলা বা কাজ করা উচিৎ নয় যাতে অন্যের মনে আঘাত লাগে অথবা কোন ব্যক্তি বিশেষের ওপর কোন প্রতিক্রিয়া আসে।

কিন্তু তিনি এতবার সাবধান করে দিলেও সাধারণ লোকের অনেকেই এত উচ্চ মন নিয়ে একে গ্রহণ করতে পারলে না। সমস্ত দেশময় একটি কথা শুধু ছড়িয়ে পড়লো—একটি প্রশ্ন—দক্ষিণ পন্থীদের দিন কি ফুরিয়ে এল? গান্ধীবাদের এই কি শেষ? অনেক সংবাদপত্রে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হল যে সত্যিই গান্ধীজীর দিন ফুরিয়ে এসেছে। গান্ধীবাদ আজকের দিনে অচল, ইত্যাদি। কিন্তু সুভাষবাবু এই ধরণের প্রচার কার্যের বরাবরই বিপক্ষে ছিলেন। তিনি বললেন, সর্বদাই আমার লক্ষ্য হবে তাঁর (মহাত্মাজীর) বিশ্বাস অর্জন করা কারণ আমি জানি যে যদি আমি ভারতের শ্রেষ্ঠ মানুষের মনই না জয় করতে পারি তাহলে অপর সকলের বিশ্বাস অর্জন করা বিড়ম্বনা মাত্র।

সুভাষবাবু ব্যাপারটাকে এত উদার ভাবে গ্রহণ করলে কি হবে অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা বিষয়টা এত সরলভাবে নিতে পারলেন না—এমন কি গান্ধীজী এই সম্বন্ধে যে মতামত দিয়েছিলেন তা শুধু বিস্ময়কর নয়—সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরাট এক ভাঙ্গনের সহায়ক মাত্র! গান্ধীজী বললেন, আমি স্বীকার করছি এই পুনর্নিবাচনের গোড়া থেকেই আমি কয়েকটা কারণে,—যে কারণ এখন আমি বলার প্রয়োজন বোধ করি না—এর বিরুদ্ধে। যেহেতু আমিই ডাঃ সীতারামীয়াকে নাম প্রত্যাহার করতে বিরত করার নিমিত্ত-

মাত্র সেইহেতু তাঁর পরাজয় আমাকেই বেশী আঘাত করেছে। সংখ্যালঘিষ্ঠ দল সংখ্যাগরিষ্ঠের কর্মপন্থার সর্ববিধ সাফল্য কামনা করবে। যদি তারা এই কর্মপন্থার সহিত সামঞ্জস্য না রাখতে পারে তাহলে তারা কংগ্রেস ত্যাগ করে চলে আসবে। যদি তারা পারে তাহলে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠের শক্তিবৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। সংখ্যালঘিষ্ঠরা কোন মতেই কোন প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করবে না। যখনি তারা সাহায্য করতে পারবে না তখনই তারা নিজেদের সরিয়ে রাখবে।

এই বিবৃতির পর সাধারণের মধ্যে কারও আর বুঝতে বাকী রইল না যে অন্তরে অন্তরে মহাত্মাজী সুভাষবাবুর ওপর সমস্ত সহানুভূতি হারিয়েছেন। এই মতামত পরোক্ষে প্যাটেল-আজাদ-রাজেন্দ্রপ্রসাদের দলের মতামতেরই পরিভাষা মাত্র। এর পর কংগ্রেসের মধ্যে গণতন্ত্রের প্রশ্ন নিরর্থক। সকলেই স্পষ্ট উপলব্ধি করলে নির্বাচনে জিতলেও সুভাষবাবুর নিজস্ব মতের স্বাধীনতাকে গান্ধীজী পর্যন্ত অন্তর থেকে সমর্থন করতে পারেন নি। অথচ অপরপক্ষে আমরা দেখেছি, এতবড় বিজয় আনন্দের মধ্যেও সুভাষবাবু এতটুকুও শ্রদ্ধা হারান নি গান্ধীজীর ওপর, উপরন্তু গান্ধীজীর শ্রেষ্ঠত্ব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছেন। গান্ধীজী যখন ভাঙ্গনের সামান্যতম ইঙ্গিত দিয়েছেন সুভাষবাবু জোর দিয়ে কংগ্রেসের এক নীতি একপ্রাণের কথা ঘোষণা করেছেন।

সুভাষবাবু দেখলেন ভাঙ্গন আসন্ন। দূর থেকে ব্যক্তিগত মতামতের সঙ্ঘর্ষ চালিয়ে, এক অপরকে জয় করার প্রবৃত্তি নিয়ে কখনও এ ভাঙ্গন রোধ করা যাবে না। দূর থেকে আপোষের চেষ্টা নিরর্থক। তাই তিনি স্বয়ং ওয়ার্ধা যাত্রা করলেন গান্ধীজীর সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনা করবার জন্যে। তিন ঘণ্টা ধরে আলোচনা চললো তাঁদের মধ্যে। আলোচনা শেষ করে সুভাষবাবু বেরিয়ে এসে বললেন যে যদিও তাঁদের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট উপসংহারে তাঁরা এসে পৌছতে পারেন নি তবুও তাঁদের আলোচনা যথেষ্ট আশাপ্রদ হয়েছে

এবং গান্ধীজী তাঁকে আগের মতই যথেষ্ট হৃদ্যতার সঙ্গে সম্ভাষণ জানিয়েছেন।

এই সংবাদ সত্যই যে আশ্বাসপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যদিও সুভাষ বাবু সাবধান করে দিয়েছিলেন যে ইতিমধ্যেই এসম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া খুব বেশী যুক্তি সঙ্গত হবে না তবুও সুভাষ বাবুর এই আশার বাণীতে যখন গান্ধীজীর সমর্থন আছে জানা গেল, তখন সত্যই সাধারণ লোকে বিশেষ আশান্বিত হয়ে উঠলো। কিন্তু এর পরেই এল গান্ধীজীর বাণী। তিনি স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে বললেন, যে অধিকাংশ প্রতিনিধির দল যখন গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে তখন তাঁর পরামর্শ নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। সুভাষ বাবু যে মতে বিশ্বাস করেন সেই মতবাদে বিশ্বাসী নেতাদের নিয়ে তিনি যেন কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা গঠন করেন; কার্যকরী সমিতিতে দক্ষিণ পন্থী নেতাদেব অংশ গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নেই।

শুধু এই বিবৃতি নয়, এর সঙ্গে বারোজন দক্ষিণ-পন্থী নেতার যুক্ত তার এলো যে তাঁরা সকলেই পদত্যাগ করতে প্রস্তুত। তার পাবার পরই সুভাষ বাবু তাদের কাছে থেকে একখানা যুক্তপত্রও পেলেন। সেই বারোজন নেতাই তাতে স্বাক্ষর করেছেন—তাঁরা হলেন—সর্দার প্যাটেল, মৌলানা আজাদ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সরোজিনী নাইডু, পট্টভী সীতারামিয়া, আচার্য্য কৃপালনী, ভুলাভাই দেশাই, হরেকৃষ্ণ মহাতাব, আবদুল গফ্ফর খাঁ, শেঠ যমুনালাল বাজাজ, জয়রামদাস, দৌলতরাম এবং আরও একজন। সেই চিঠিতে লেখা ছিল—যাঁরা নিজেদের যুক্তিবাদী ও অগ্রগামী বলে মনে করেন তাঁরা আমাদের কার্যের সমালোচনায় সন্তুষ্ট না থেকে নিজেরাই যেন সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বহুদিন এই অবস্থা সহ্য করা হয়েছে, এখন যখন বামপন্থী দলের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে তখন তাঁদেরই কংগ্রেসকে স্বাধীনভাবে চালনা করবার সুযোগ দেওয়া উচিত। যদি তাঁরা ব্যর্থ হন তাহলে দেশ মস্ত বড় একটা প্রয়োজনীয় শিক্ষা পাবে।

সর্বাপেক্ষা অনুশোচনার বিষয় এই যে যখন তাঁরা এই পত্র পাঠালেন তখন সুভাষ বাবু ১০৩ ডিগ্রি জ্বরে শয্যাগত। শুধু শয্যাগত বললে ভুল হবে তিনি রোগের প্রকোপে প্রায় জ্ঞানশূন্য! অথচ যাঁরা এই পত্র পাঠালেন তাঁরা মুক্তি-সংগ্রামের এক একটি মহারথ, যারা বহু নির্যাতন ও যন্ত্রণা ভোগের সময় সমস্ত নেতাদের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছেন, ভাগ করে সমস্ত লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন, অপরের দুঃখে অন্যের হৃদয় সমবেদনায় আপ্লুত হয়ে উঠেছে…। তাদের কাছ থেকে এই অবস্থায় এমন ব্যবহার দেশ কি আশা করতে পেরেছিল?

সুভাষবাবু বীরের মত স্থির ভাবে এই পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করলেন। তিনি জানতেন এই পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করবার দায়িত্ব কতখানি। এর ফলে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ড ভেঙ্গে যাবে, ওয়াকিং কমিটিও ভেঙ্গে যাবে, এমন কি সম্পাদক পর্যন্ত পদত্যাগ করেছেন। অর্থাৎ সমস্ত কার্যভার তাঁকে এই অসুস্থ শরীর নিয়েই বহন করতে হবে। কিন্তু তবু তিনি এতটুকুও বিচলিত হলেন না। পদত্যাগ-পত্র স্বীকার করে নিয়ে সমস্ত বিরুদ্ধ সম্ভাবনার বিরুদ্ধে নিজের সমস্ত নিষ্ঠার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেন।

এদিকে ত্রিপুরী অধিবেশনের দিন ঘনিয়ে আসছে। ডাঃ নীলরতন সরকার সুভাষবাবুকে পরীক্ষা করে এই মর্মে এক বুলেটিন দিলেন যে বর্তমানে তাঁর শরীরের অবস্থা বিবেচনা করে অধিবেশন এক পক্ষ কাল স্থগিত রাখা হোক না হলে বিশেষ সঙ্কট উপস্থিত হতে পারে।

এই বুলেটিনের পর হয় অধিবেশন স্থগিত রাখতে হয় আর না হয় ত সুভাষ-বাবুর পক্ষে পদত্যাগ পত্র দাখিল করা ছাড়া আর উপায় নেই। সকলেই আশা করেছিল হয় ত অধিবেশন স্থগিত রাখা হবে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হল না। এবং যদিও গান্ধী ভাবাপন্ন বহু কংগ্রেস কর্মী চারিদিক থেকে দাবী জানাতে লাগলেন যে যদি সুভাষ বাবু দক্ষিণ পন্থী নেতাদের বিরুদ্ধে তাঁর মতামত প্রত্যাহার

না করেন তাহলে তাঁরা তার উপর অনাস্থা প্রস্তাব আনবেন, সুভাষ বাবু এতেও বিচলিত হলেন না। তিনি শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে প্রস্তুত আছেন, তবু অন্যায় দাবীর সামনে মাথা হেঁট করতে পারবেন না।

ফলে, নির্দিষ্ট দিনেই ত্রিপুরীর অধিবেশন সুরু হল। সভাপতিও উপস্থিত হলেন ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে! এর আগে হরিপুরার কংগ্রেসে যে সভাপতিকে অভূতপূর্ব শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে আনা হয়েছিল সেই সভাপতিই আজ এক রকম উত্থানশক্তি রহিত অবস্থায় এ্যাম্বুলেন্স যোগে সভাক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলেন। এই দুই দৃশ্য সত্যিকারের দেশপ্রেমিক ভারতবাসীর মনে চিরজাগরূক থাকবে। মিথ্যা আত্মমর্যাদা ও নেতৃত্বের আশঙ্কা মহৎ ব্যক্তিকেও হিংসা ও কূট বুদ্ধির নিম্ন স্তরে নামিয়ে নিয়ে যায়। ত্রিপুরী কংগ্রেস তারই জ্বলন্ত নিদর্শন।

তা যদি না হত তাহলে যাঁরা সম্পূর্ণভাবে কংগ্রেসের সমস্ত দায়িত্ব সুভাষবাবুর স্কন্ধে চাপিয়ে দিলেন এবং বিনা বাধায় তাঁর নিজস্ব মতামতের উপর নির্ভর করেই কংগ্রেসকে পরিচালনা করবার হুমকি দিলেন তারাই আবার তাঁকে অপদস্থ করবার জন্যে সমবেত হলেন ত্রিপুরী কংগ্রেসে, তাঁদের সমস্ত কূটবুদ্ধিকে জাগ্রত রেখে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে গোবিন্দবল্লভ পন্থ এই প্রস্তাব তুললেন যে, এতদিন কংগ্রেস যে গান্ধীবাদের অনুসরণ করে আসছে এই কমিটি সেই গান্ধীবাদের ওপরই পুনর্বার তাদের অবিচলিত শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা অর্পণ করছে। এই পদ্ধতির কোন পরিবর্তন তারা মানবে না। বর্ত্তমান পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে এই কমিটি মনে করে যে গান্ধীজীর ওপরই কংগ্রেসের নেতৃত্ব অর্পণ করা হোক। সেইজন্য কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ যেন আগামী সভাপতি নির্বাচনে গান্ধীজীর ইচ্ছার ওপরই আশ্রয় করেন।

এই হল গোবিন্দবল্লভের প্রস্তাবের সারমর্ম। অবশ্য সভাপতি এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করলেন না। কোন রকম সংশোধনও

করা হল না। ফলে গান্ধীপন্থী দলেরই জয় সুনিশ্চিতভাবে নির্ধারিত হয়ে গেল।

১৩ই মার্চ সাধারণ অধিবেশন। কিন্তু তার আগে সুভাষবাবুর শরীর অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল। ডাক্তারেরা পরামর্শ দিলেন জব্বলপুর হাঁসপাতালে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হোক। কিন্তু সুভাষবাবু তাতে রাজী হলেন না। পণ্ডিত জওহরলালও তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু তিনি বললেন, আমি হাঁসপাতালে যাবার জন্যে এখানে আসি নি। এখানকার অধিবেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে স্থানান্তরিত হওয়ার চেয়ে মৃত্যুকে বরণ করা শ্রেয়ঃ মনে করি।

অধিবেশন সুরু হল। সুভাষবাবুর পরিবর্তে তাঁর একখানা ফটো ৫২ হাতী বাহিত রথে শোভাযাত্রা করে নিয়ে আসা হল মণ্ডপে। যাই হোক সাধারণ অধিবেশনেও তাঁকে পরাজয় স্বীকার করতে হল। এমনকি সোশ্যালিষ্ট পার্টিও তার বিরুদ্ধাচরণ করতে দ্বিধাবোধ করলে না। কিন্তু সুভাষবাবু পদত্যাগ করলেন না। উপরন্তু সকলের নির্দেশ মত স্বাস্থ্যের একটু উন্নতি হলেই গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সম্মত হলেন। এর মধ্যে তিনি কোলকাতায় ফিরে এলেন।

কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য এতই ভেঙ্গে পড়েছিল যে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠলো। বিরুদ্ধ দল বলতে লাগল যে ইচ্ছে করেই তিনি দেখা করছেন না। তাই তিনি গান্ধীজীকে অনুরোধ করলেন কোলকাতায় এসে দেখা করতে। কিন্তু কোন ফল হল না। অগত্যা সুভাষবাবু যখন দেখলেন মীমাংসার কোন পথ নেই তখন কোলকাতায় তিনি এ, আই, সি, সির এক জরুরী অধিবেশন ডাকলেন। এই কোলকাতায় কত বড় বড় সংগ্রামের প্রথম উদ্ভব সম্ভব হয়েছে, কত বীর নেতা নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন এই কোলকাতা নগরীর বুকের উপর দাঁড়িয়ে। এবারেও সুভাষবাবু তাঁর চরম বিচারের পটভূমি হিসাবে কোলকাতারই নাম প্রস্তাব করলেন। অনেকে মন্তব্য করলেন যে বাঙ্গলাদেশে অর্থাৎ কোলকাতায় এ মীটিং হলে বাঙ্গলার উগ্রপন্থী—সুভাষপন্থী তরুণের দল

হয়ত ত্রিপুরীর. অপমানের প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে। তাঁরা মনে করলেন কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের হয়ত মর্যাদা হানি হতে পাবে। কিন্তু সুভাষবাবু তাঁদের এই মিথ্যা আশঙ্কার প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, যাঁরা এইরকম আশঙ্কা করতে পারেন তাদের বাঙ্গলা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই। এ, আই, সি সি'র মীটিং করার সুবিধা পাওয়া যে কোন প্রদেশের পক্ষে সৌভাগ্য, সম্মান ও বহু ঈপ্সিত সুযোগের বস্তু। এই ক্ষেত্রে বাঙ্গলার অধিবাসীবৃন্দ বিশেষ করে কোলকাতাবাসিরা সমস্ত ভারতের আতিথ্য গ্রহণ করবে। আমি নিশ্চিত জানি যে দেশ প্রেম ও আতিথেয়তার গর্ব বাঙ্গালী বস্তুতই করতে পারে সেই ঐতিহ্য বজায় রাখবার জন্য আমাদের অতিথিদের যতদূর সম্ভব হৃদ্য অভ্যর্থনা জ্ঞাপন ও আমাদের রীতি অনুযায়ী অতিথেয়তা প্রদর্শন করা হবে।

এই উক্তির পর বিরুদ্ধ মন্তব্যের আর কোন সুযোগ রইল না। ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে কোলকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে মীটিং বসলো। এবং কার্য-ক্ষেত্রে দেখা গেল সত্যিই বাঙ্গলা দেশ রাজকীয় সম্মান ও সম্বর্দনা দেখিয়েছে তার অতিথিদের। তবে দু'একটা বিসদৃশ ও অবাঞ্ছিত ঘটনা যে ঘটেনি, তা নয়। রাজেন্দ্র প্রসাদের দিকে এক পাটি জুতোও ছোড়া হয়েছিল। তবে সকলক্ষেত্রে দেখা গেছে সুভাষবাবু স্বয়ং সবার আগে দাঁড়িয়ে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নেতাদের সম্মান রক্ষা করেছেন এবং ঐ দুর্ঘটনার জন্য তিনি ক্ষমা চেয়েছিলেন।

দক্ষিণপন্থী দল তাঁদের সব শক্তি নিয়েই এসেছিলেন। ত্রিপুরীতে একবার যে জয় তাঁদের হয়েছে সেই জয়ের রেশ তাদের বজায় রাখতেই হবে। এদিকে বাঙ্গলার তরফ থেকেও যথেষ্ট চেষ্টা হয়েছে আসন্ন ভাঙ্গন থেকে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে পরিত্রাণ দেবার জন্যে। কিন্তু তাঁরাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছেন যাঁদের আপাতঃ উদ্দেশ্য শুধু জয়ী হওয়া মাত্র—জাতীয় ঐক্য নয়। তাই একান্ত বাধ্য হয়েই এযাবৎ সুভাষচন্দ্র যা করতে বিরত ছিলেন তাই করতে বাধ্য হলেন।

কোলকাতা কংগ্রেসের কলঙ্কিত অধ্যায়ের শেষ যবনিকা পড়লো সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগ ঘোষণা করে।

ত্রিপুরীর মত, ভারতের আর একটি শ্রেষ্ঠ সন্তান জওহারলাল এবারেও এসে ছিলেন তাঁকে নিবৃত্ত করতে।

কিন্তু, তীর তখন ছোঁড়া হয়ে গেছে লক্ষ্যের দিকে।

স্বরূপ

লক্ষ্য কোন দিকে ?

স্বভাব-বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র জীবন-আদর্শের সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়ালেন। কংগ্রেসের প্রাসাদের সব কয়টি প্রবেশদ্বারই তার সামনে বন্ধ হয়ে গেছে, যে সোশ্যালিষ্ট পার্টিকে এযাবৎ বরাবর সমর্থন করে এসেছেন, তাদের কণ্ঠেও আজ ভিন্ন সুর। কমিউনিষ্ট পার্টি তাঁর কাছে বরাবরই পরিত্যাজ্য, তাহলে স্বদেশের মধ্যে বসে লক্ষ লক্ষ অনুরাগী দেশবাসীর মধ্যেই তিনি নির্বাসিত হয়ে গেলেন ?

কিন্তু, তিনি জানতেন পথ খোলা আছে। তিনি জানতেন ভারতের বিরাট তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে উগ্রপন্থী বিপ্লবীদের কাছে তাঁর স্থান কোথায় ? তিনি জানতেন কিষাণ মজুরদের মাঝখানে তাঁর প্রতিপত্তি কতখানি।

এবং এই জানাজানির মধ্য থেকেই ফরওয়ার্ড ব্লকের শুভ আবির্ভাব।

নাম থেকেই ধারণা করে নেওয়া যেতে পারে যে ফরওয়ার্ড ব্লক অর্থে যত অগ্রগামী দল আছে তাদের একটা সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান! যতদিন তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে আছেন এবং বিশেষ করে দেশবন্ধুর পরলোক গমনের পর থেকে—তিনি সর্বদা কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী দলের একটা ব্লক খাড়া করে তুলতে যত্নবান।

জেনারেল মোহন সিং, জি ও. সি.

পুরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের কুচকাওয়াজ

বিশেষতঃ ইউরোপে প্রবাসের সময় বিঠলভাই প্যাটেলের সহযোগিতায় দক্ষিণপন্থী পরিচালিত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যেভাবে আক্রমণ করে আসছেন তাতে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ কারও থাকতে পারে না।। কিন্তু ত্রিপুরী কংগ্রেসের এবং কোলকাতা কংগ্রেসের ট্রাজেডীর পরই ফরওয়ার্ড ব্লকের উৎপত্তি যখন সম্ভব হল তখন সহজেই প্রশ্ন ওঠে যে ফরওয়ার্ড ব্লক এই কোলকাতা কংগ্রেসেরই প্রতিক্রিয়া কি না!

প্রতিক্রিয়া এ নয়। ফরওয়ার্ড ব্লক সুভাষচন্দ্রের জীবনের ক্রমবিকশিত স্বরূপেব চরম অধ্যায় মাত্র। প্রতিক্রিয়া এই জন্য নয় যে প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কোন ফিলজফি বা তত্ত্ব থাকে না যা ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্যে পুরোমাত্রায় আছে। ফরওয়ার্ড ব্লকের ফিলজফি কি?

মান্দালয় জেল থেকে মুক্তি পাবাব পর থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের যে সংঘাত সুরু হয় সে সংঘাত কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হিসেবে কোন রকম আপোষ-হীন পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী নিয়ে। লাহোর কংগ্রেসে এই পূর্ণ স্বাধীনতাই কংগ্রেসের আদর্শ হিসেবে স্বীকৃত হয় এবং এই লাহোর কংগ্রেসের এই স্বীকৃতির দিনকেই স্বাধীনতা দিবস বলে প্রতি ২৬শে জানুয়ারী সারা ভারতবর্ষ জুড়ে—এবং প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যেও নিষ্ঠার সঙ্গে আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হয়।

পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলেও কংগ্রেসের মধ্যে আপোষের ইচ্ছা একেবারেই লুপ্ত হয়ে যায় নি। বিশেষতঃ ১৯৩৩ সালের আন্দোলনের হঠাৎ পরিসমাপ্তিতে সুভাষচন্দ্রেব মনে যে ক্ষোভের সঞ্চার হয় তার থেকেই কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় সংঘাতের সুরু। তারপর ইউরোপের সমস্ত বক্তৃতা সমস্ত রচনার মধ্যে কংগ্রেসেব এই মনোভাবের বিরুদ্ধে তাঁর অসন্তোষ শুধু তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে এবং তিনি একটি মাত্র দলের সর্বাধিনায়কত্বে ভারতের ভাগ্যনিরূপণের পরিকল্পনা করেছেন। এ সব কথা আমরা আগেই শুনেছি। যাই হোক সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যেব বিষয় এই যে, যতদিন তিনি ইউরোপে

ছিলেন ততদিন তিনি এই 'একই' দলের সর্বাধিনায়কত্বের ওপর জোর দিলেও কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে হরিপুরায় তিনি যে বক্তৃতা দিলেন তাতে ভিন্ন সুর শোনা গেল। তিনি বললেন কংগ্রেসের মধ্যে সোশ্যালিষ্ট পার্টি, লেফটিস্ট পার্টি প্রভৃতির স্থান আছে। তাঁর এই মত পরিবর্তনের কারণ এই যে তিনি কংগ্রেসের মধ্যে আসন্ন ভাঙ্গনকে প্রতিহত করবার জন্যে বদ্ধ পরিকর। অথচ, ভাঙ্গন এল বিপক্ষ দিক থেকেই! এবং এই ভাঙ্গনের মধ্য থেকেই যখন ফরওয়ার্ড ব্লকের উৎপত্তি তখন তার মধ্যে যে তাঁর সেই নব-পরিকল্পিত সুরের ধ্বনি আবার শোনা যাবে তাতে সন্দেহ কি?

ইতিপূর্বেই তরুণ-নেতা হিসাবে অনেকবারই তিনি কংগ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে তরুণদের নিয়ে এবং কিসাণ মজুরদের নিয়ে সভা আহ্বান করেছেন অধিবেশন চালিয়েছেন; জনসাধারণের ওপর সেই ক্ষমতা তাঁর বরাবরই ছিল। তার ওপর হরিপুরার অধ্যায়ের পর তিনি যেভাবে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ভ্রমণ করে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন তাতে তাঁর জনপ্রিয়তা অভাবনীয়ভাবে বেড়ে গিয়েছিল। এবং তাঁর বক্তৃতার মধ্যে বামপন্থী দলের মনোভাব যে স্পষ্ট হয়ে উঠতো সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উপরন্তু তিনি প্রকাশ করে বলেছিলেন যে এই র‍্যাডিক্যাল দলগুলির মধ্যে যারা সোশ্যালিষ্ট পার্টি কিংবা কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিতে রাজী নয় তাদের নিয়ে একটা দল গড়ে তুলতে হবে। এবং এইভাবেই দেশের মধ্যে মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তি গড়ে উঠবে।

ফরওয়ার্ড ব্লক উক্ত মনোভাবের আর একটি অখণ্ড প্রকাশ। যার ফলে এক বছরের মধ্যে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এই দল গড়ে উঠলো এবং বাঙ্গলা দেশে ফরওয়ার্ড ব্লকের শক্তির কাছে কংগ্রেস পঙ্গু হয়ে গেল।

গোড়ার দিকে সুভাষচন্দ্র সমস্ত বামপন্থী দল যেমন, সোশ্যালিষ্ট, কমিউনিষ্ট, রায় গ্রুপ এবং সুভাষচন্দ্রের বামপন্থী জাতীয়তাবাদী বা লেফটিষ্ট ন্যাশানালিষ্টের

দল—এই সবার সঙ্গে একটা মিলিত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সোশ্যালিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধতার জন্য এই আয়োজন সম্ভব হয় নি। দুর্ভাগ্যের কথা সন্দেহ নেই। সোশ্যালিষ্ট পার্টি বলেছিল ফরওয়ার্ড ব্লকের ভবিষ্যৎ নীতির ওপর তাদের কোন আস্থা নেই। বিশেষ করে এর পররাষ্ট্র নীতি তারা মেনে নিতে পারছে না। যে সুভাষচন্দ্রকে একদিন তাদের নেতা বলে তারা গ্রহণ করেছিল তাদেরই এমন মনোভাবের কারণ কি? আমরা দেখেছি জওহরলাল নেহরু সোশ্যালিষ্ট পার্টির অন্যতম নেতা। কমিউনিজম্ ও ফ্যাসিজমের গুণাগুণ বিচার নিয়ে প্রবাসী সুভাষচন্দ্র ও ভারতের জওহরলালের সঙ্গে মনোমালিন্য সুরু হয়ে গিয়েছিল। এবং সুভাষবাবুর শারীরিক অনুপস্থিতির সময় জওহরলাল এদের উপর নিজের প্রভাব বেশ দৃঢ়ভাবেই বিস্তার করে রেখেছিলেন। তাই ফরওয়ার্ড ব্লক সম্বন্ধে নেহরু স্পষ্টই বললেন যে এর মধ্যে নানারকম দল এসে ঢুকেছে—সুবিধাবাদী অর্থাৎ যাদের কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিবাদ আছে--তা ছাড়া আছে উগ্র জাতীয়তাবাদী দল যারা ইউরোপে যুদ্ধ সুরু হলে জার্মানী ও ইটালীকে সাহায্য করতে উন্মুখ হবে কারণ জার্মানী ও ইটালীর কাছ থেকে তারা তাদের আদর্শ নিয়েছে।

আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার ফলে ইটালীর ওপর অর্থাৎ ফ্যাসিজমের ওপর সকলেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সুতরাং পণ্ডিত নেহরু যখন ফরওয়ার্ড ব্লককে ইটালীর অনুগ্রাহক বলে ঘোষণা করলেন তখন দেশের মধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লকের বিরুদ্ধে একটা অসন্তোষ ঘনিয়ে উঠবে তাতে আর সন্দেহ কি? ওদিকে ফরওয়ার্ড ব্লকের তথা সুভাষচন্দ্রের কাজ হল কংগ্রেসের মধ্য থেকে ফ্যাসিবাদের যা কিছু উপকরণ আছে তাকে বিদূরিত করবার জন্য আন্দোলন করা। তাঁর মতে কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ গণতন্ত্রের পরিবর্তে ফ্যাসিবাদেরই অনুকরণ করে চলেছে। তিনি কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ডকে হিটলারাইট বলে ঘোষণা করলেন। অথচ তাঁরই সৃষ্ট ফরওয়ার্ড ব্লকের নীতি হল এক নেতার

নেতৃত্বে বিশ্বাস, এক পার্টির আধিপত্যে আস্থা, সামরিক শৃঙ্খলা ও যুব জাগরণ। এবং তিনি নিজের মুখে বললেন যে তাঁর নীতি ফ্যাসিজম নয় আবার সোশ্যালিজম-ও নয়—এ দুয়ের অভিনব মিশ্রণ!

এই দুটি ঘোষণা—একদিকে কংগ্রেস থেকে ফ্যাসিজমের মূলোৎপাটন এবং অন্যদিকে ফ্যাসিজমের সঙ্গে মিশ্রণ করে দল গত নীতির উদ্বর্তন, পরস্পর বিরোধী মনে হলেও এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে কার্যতঃ তিনি ফ্যাসিষ্ট নন। তাঁর আজীবনের আদর্শ দেশকে এক অদ্ভুত চেতনায় জাগ্রত করে তোলা, দেশের জনসাধারণের মধ্যে সুপ্ত শক্তিকে সামরিক শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে পুনরায় উজ্জীবিত করে তোলা। এই আদর্শকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে গেলে এক নেতার—এক পার্টির কঠোর শাসন ও একাধিপত্যের প্রয়োজন। এবং সেই দিক থেকে বিচার করলে ফরওয়ার্ড ব্লকের মূলনীতির যথেষ্ট যাথার্থ্য আছে। এবং সেইজন্যেই বলি ফরওয়ার্ড ব্লকের উৎপত্তি সুভাষচন্দ্রের স্বরূপ বিকাশের শেষ অধ্যায়!

অপরদিকে, যদি জনসাধারণকে জাগ্রত করে তোলাই উদ্দেশ্য হয় তাহলে গান্ধীবাদের স্থান কোথায়? বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহামানব মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অহিংসা মতবাদের কি কোনও মূল্য নেই? বিষয়ের গুরুত্বের দিক থেকে বিবেচনা করলে এই আলোচনা আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা হলেও এই আলোচনার ব্যর্থ প্রচেষ্টারও একটা মূল্য আছে বলে মনে হয়। তাই এই যুক্তির অবতারণা।

মহাত্মা গান্ধী এবং সুভাষচন্দ্রের জীবনের রাজনৈতিক আদর্শের তুলনা করতে গেলে—অন্তর্নিহিত মূল বৈষম্যের সঠিক ধারণা করতে গেলে সবচেয়ে সহজ উপায় তাঁদের ধর্মগত জীবনের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা। এঁরা দুজনেই ধর্মে বিশ্বাস করেন। শুধু বিশ্বাস করা নয় ধর্মকেই এঁরা জীবনের মেরুদণ্ড বলে স্বীকার করে

নিয়েছেন। আজকের দিনে গান্ধীজী শুধু রাজনৈতিক নেতা নন তিনি ধর্মেরও উপদেষ্টা তেমনি সুভাষচন্দ্রের বৈপ্লবিক জীবনের পশ্চাতে আছে এই ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা। নির্জন কারাপ্রাচীরের পশ্চাতে কিংবা মুখর রণক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে ভগবানকে স্মরণ এবং ধ্যানধারণার একটা বিশিষ্ট ও নির্দিষ্ট স্থান আছে। এমন কি যে কেহ তাঁর সংস্পর্শে এসেছে, তার নিকট জীবনের আদর্শসম্বন্ধে উপদেশ নিতে এসেছে তিনি তাকে ধর্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়ে ছেড়েছেন।

একদিকে যেমন ধর্ম অন্য দিকে তেমনি ব্রহ্মচর্যের ওপর দুজনেই সমান জোর দিয়েছেন। আজীবন ব্রহ্মচারী থেকে মানুষ কি অমিত বীর্যের অধিকারী হতে পারে শুধু বক্তৃতার মধ্য দিয়ে নয়, নিজের জীবন দিয়ে সুভাষচন্দ্র তা প্রমাণ করে গেছেন। বিবাহের কথা দূরে থাক তিনি কোনদিন কোনও স্ত্রীলোককে মাতৃভাবে বা ভগিনীভাবে ছাড়া অন্য কোন ভাবে চিন্তা পর্যন্ত করেন নি। তাকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি বিবাহ করেন নি কেন? তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, যে জীবনে তিনি বিবাহ করবার অবসর পান নি। এবং অন্যত্র এই একই প্রশ্নের উত্তরে একজন জাপানী উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে পরিহাস করে বলেছিলেন, বহুদিন আগেই ভারতবর্ষের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়ে গেছে। তিনি একবার লিখেছিলেন, কামজয়ের প্রধান উপায় সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে মাতৃরূপ দেখা ও মাতৃভাব আরোপ করা এবং স্ত্রী-মূর্তিতে (যেমন দুর্গা কালী) ভগবানের চিন্তা করা। স্ত্রী-মূর্তিতে ভগবানের বা গুরুর চিন্তা করিলে মানুষ ক্রমশঃ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে ভগবানকে দেখিতে শিখে। সে অবস্থায় পৌছিলে মানুষ নিষ্কাম হইয়া যায়। এইজন্য মহাশক্তিকে রূপ দিতে গিয়া আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা স্ত্রী-মূর্তি কল্পনা করিয়াছিলেন। ব্যবহারিক জীবনে সকল স্ত্রীলোককে 'মা' বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে মন ক্রমশঃ পবিত্র ও শুদ্ধ হইয়া যায়।

অন্যত্র, চরিত্রগঠনের উপযোগিতা সম্বন্ধে লিখেছিলেন,—মানুষের দৈনন্দিন

কাজ করেই সন্তুষ্ট বোধ করলে চলবে না। এই সব কাজ-কর্মের যে উদ্দেশ্য এবং আদর্শ অর্থাৎ আত্মবিকাশ সাধন—সে কথা ভুললে চলবে না। কাজটাই চরম উদ্দেশ্য নয়, কাজের ভিতর দিয়ে চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে হবে এবং জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করতে হবে! মানুষকে অবশ্য নিজের ব্যক্তিত্ব ও প্রবৃত্তি অনুসারে একদিকে বৈশিষ্ট্য লাভ করতে হবে, কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যের মূলে (Specialisation) একটা সর্বাঙ্গীন বিকাশ চাই। যে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন উন্নতি হয় নাই সে অন্তরে কখনও সুখী হতে পারে না; তার মনের মধ্যে সর্বদা একটা শূন্যতা বা অভাববোধ শেষ পর্যন্ত রয়ে যায়। এই সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য চাই—(১) ব্যায়াম চর্চা (২) নিয়মিত পাঠ (৩) দৈনিক চিন্তা বা ধ্যান।

এই দিক থেকে রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং তদীয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ সুভাষচন্দ্রের গুরু। সুভাষচন্দ্রের জীবন স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ জীবন পরিকল্পনার চূড়ান্ত প্রতিফলন মাত্র। সুভাষচন্দ্র নিজে বলেছিলেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দ একই শক্তির দুটি অখণ্ড প্রকাশ মাত্র। আমার জীবনকালে স্বামীজী যদি জীবিত থাকতেন তাহলে আমি আগে গিয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতাম।

তাছাড়া যখনই কোন উপদেশপ্রার্থী তাঁর নিকট চরিত্রগঠনের উপায় সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন তখনই তিনি বলেছেন বিবেকানন্দের রচনাবলী দৈনিক পাঠ করতে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। বিবেকানন্দের রচনাবলীর মধ্যে তিনি 'বিবেকবাণী, 'পত্রাবলী' ও 'বক্তৃতাবলীর' ওপরই বিশেষ জোর দিতেন। দেশবন্ধু—তাঁর জীবনের রাজনৈতিক গুরুর মহাপ্রয়াণের পর দেশের মধ্যে যখন তীব্র দলাদলি চলেছে তখন তিনি মান্দালয় জেল থেকে আক্ষেপ করে লিখেছিলেন—আমি ত' জানিতাম সেবার আদর্শ এই—'দাও দাও ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল'। যে বাঙ্গালী এত শীঘ্র দেশবন্ধুর ত্যাগের কথা ভুলিয়াছে—সে যে কতদিনের আগেকার স্বামী বিবেকানন্দের 'বীরবাণী' ভুলিবে—ইহা আর বিচিত্র কি?

হে হতভাগ্য বাঙ্গালী সুভাষচন্দ্রের এই ক্ষোভ মেটাবার দায়িত্ব কি তোমার এখনও আসে নি ?

বিবেকানন্দের শিষ্য সুভাষচন্দ্র যে মহাশক্তির উপাসক হবেন তাতে আর বিচিত্র কি ? যিনি ভারতের শক্তিকে সুষুপ্তির তমসা থেকে মহান আলোকের পানে জাগ্রত করবার ব্রত নিয়েছিলেন তিনি নিজের আত্মার শক্তিকে জাগ্রত করবার জন্য মহাশক্তির আরাধনা করবেন সেইটেই স্বাভাবিক। তিনি লিখেছেন—জগতের মূল সত্য আদ্যাশক্তি, যাহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় অথবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—সেই আদ্যাশক্তিকে সাধক মাতৃরূপে আরাধনা ও পূজা করে থাকে। বাঙ্গালীর উপর তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাব খুব বেশী বলিয়া বাঙ্গালী জাতিহিসাবে মায়ের অনুরক্ত এবং ভগবানকে মায়ের রূপে আরাধনা করিতে ভালবাসে।······বাঙ্গালী যে ভগবানকে—শুধু ভগবানকে কেন, বাঙ্গালা দেশকে এবং ভারতবর্ষকে মাতৃরূপে কল্পনা করিতে ভালবাসে—এ কথা সর্বজনবিদিত।

অন্যত্র—

ভয় জয় করার উপায় শক্তিসাধনা। দুর্গা কালী প্রভৃতি মূর্তি শক্তির রূপবিশেষ। শক্তির যে কোন রূপ মনে মনে কল্পনা করিয়া তাঁহার নিকট শক্তি প্রার্থনা করিলে এবং তাহার চরণে মনের দুর্বলতা ও মলিনতা বলিস্বরূপ প্রদান করিলে মানুষ শক্তি লাভ করিতে পারে। আমাদের মধ্যে অনন্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে, সেই শক্তির বোধন করিতে হইবে। পূজার উদ্দেশ্য—মনের মধ্যে শক্তির বোধন করা। প্রত্যহ শক্তিরূপ ধ্যান করিয়া শক্তিকে প্রার্থনা করিবে পঞ্চেন্দ্রিয় ও সকল রিপুকে তাঁহার চরণে নিবেদন করিবে। পঞ্চপ্রদীপ অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মায়ের পূজা হইয়া থাকে। আমাদের চক্ষু আছে তাই আমরা ধূপ গুগ্‌গুল্ প্রভৃতি সুগন্ধি জিনিষ দিয়া পূজা করি ইত্যাদি। বলির অর্থ রিপুর বলি—কারণ ছাগই কামের রূপবিশেষ।

শাক্ত সুভাষচন্দ্র ও বৈষ্ণব গান্ধীজীর জীবনের আদর্শের মূল বৈষম্য এইখানেই।

আসলে সুভাষচন্দ্র ও গান্ধীজীর একই বৃন্তের দুটি ফুল—একই শক্তির দুই অখণ্ড প্রকাশ।

সুভাষচন্দ্রের রহস্যজনক অন্তর্ধানের পর ইংলণ্ডের নিউজ রিভিয়ু মহাত্মাজী ও সুভাষচন্দ্রকে তুলনা করে লিখেছিল—'Plump, amiable Subhas Chandra Bose, ex-president of the Congress. later Leader of the Swarajya (Self rule) Party, had a programme which was as different from the mild Mahatma as chalk from cheese.

প্রধান প্রধান যুক্তি—

(১) সুভাষচন্দ্রের দাবী বৃটনেব কাছ থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা (গান্ধীজী আপোষে রাজী আছেন)।

(২) জাতীয় আন্দোলনের অবারিত গতি (গান্ধী স্থগিত রাখতে চেয়েছেন)।

(৩) ব্যাপক শিল্পের প্রসার বা Progressive industrialisation (গান্ধীজী তাঁর প্রিয় খেয়াল বশতঃ এর বিরোধী এবং কুটিরশিল্পের প্রসারে যত্নবান)।

এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে সুভাষচন্দ্রই জাতীয় পরিকল্পনার বা national planningএর প্রবর্তক।

সর্বশেষে গান্ধীসম্বন্ধে লিখিত সুভাষচন্দ্রেব কয়েকটি কথার উল্লেখ করি—গান্ধীজীর মধ্যে এমন কিছু আছে যা ভারতীয় জনসাধারণকে আকৃষ্ট করে। অন্য দেশে জন্মালে তিনি হয়তো একেবারেই বাতিল হয়ে যেতেন·· যেখানেই তিনি যান দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্রতম ব্যক্তিও বুঝতে পারে যে তিনি ভারতের মাটিতেই গড়া—অস্থিতে এবং মজ্জাতে। তিনি যখন কথা বলেন তা এমন ভাষায় বলেন যার মর্ম তারা বুঝতে পারে—এবং সে ভাষা হার্বার্ট স্পেন্সার বা এডমণ্ড বার্কের নয়—যেমন ধরুন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ব্যবহার করতেন—সে ভাষা ভগবদ্‌গীতা এবং রামায়ণের ভাষা।

আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ফরওয়ার্ড ব্লকের আদর্শ বা ফিলজফি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করা। কিন্তু আলোচনার খাতিরে আমরা বহুদূরে এসে পৌঁছে গেছি। এখন পুনরায় আমাদের আসলের বক্তব্যের দিকে ফিরে যাওয়া যাক। সুভাষচন্দ্র নিজে ফরওয়ার্ড ব্লকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তারই সারাংশটুকুর উল্লেখ করলেই মনে হয় আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। যথা—

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারতের মৃত্তিকা-উদ্ভূত এক আন্দোলনের প্রতীক। কংগ্রেসের উন্নতি ও শক্তিবৃদ্ধি আভ্যন্তরীণ তাগিদের ফল; এই আভ্যন্তরীণ তাগিদের ফলেই ফরওয়ার্ড ব্লকের জন্ম হয়েছে। কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার কিংবা আকস্মিক ঘটনার ফলে ভারতীয় রাজনীতিতে এই নূতন বস্তুর সৃষ্টি হয় নি। কংগ্রেস তার বিবর্তনের পথে নূতন অবস্থায় প্রবেশ করবে বলে ফরওয়ার্ড ব্লকের আবির্ভাব হয়েছে।...প্রগতি একপথগামী কিংবা সর্বদা শান্তিপূর্ণ নয়। অনেক সময় বিরোধের মধ্য দিয়েই প্রগতি ঘটে!

জীবিত কিংবা প্রগতিশীল প্রত্যেক আন্দোলনেই একটা অদৃশ্য বামশাখা বা বিরোধী দল থাকে। সময় হলে এই অদৃশ্য বামশাখা সুস্পষ্ট হয় এবং তার সাহায্যে আন্দোলনের আরও পুষ্টিলাভ এবং উন্নতি ঘটে। অনেক সময় এরূপ ঘটে যে, বামশাখা দক্ষিণ শাখার সঙ্গে আপোস ও সহযোগিতা করে শক্তিসঞ্চয় এবং প্রভাব বিস্তার করে। ভিন্নরূপ অবস্থায় তীব্র মতভেদের সৃষ্টি অপরিহার্য হতে পারে, ঐ মতভেদ সাময়িক ভাবে ব্যথাদায়ক হলেও প্রকৃতপক্ষে প্রগতির সহায়ক। কোনও প্রতিষ্ঠানের উন্নতির পক্ষে বামশাখার পুষ্টি ও আবির্ভাব একান্ত আবশ্যক।...১৯২০ সালে গান্ধীপন্থীরা কংগ্রেসে বামপন্থী ছিলেন; তার মানে এ নয় যে বর্তমান সময়েও তারা বামপন্থী। ইতিহাসের পুনরাবর্তনক্রমে নিশ্চয়ই নতুন এক বামশাখার উদ্ভব হয়ে পরিণামে পূর্বের বামপন্থীদের বিতাড়িত করে দেবে।

কোলকাতা কংগ্রেসে দেখা গেল দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা

করতে অসম্মত হয়েছেন। এখন ঐক্যের খাতিরে আমরা বামপন্থীরা যদি তাঁদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করি, তবে সেটা কি সঙ্গত হবে? যদি তাঁদের কোন সক্রিয় কর্মপন্থা থাকতো তবে এইরূপ করা চলতো। কিন্তু গত মার্চ ও এপ্রিল মাসে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমার যে সব পত্র-বিনিময় হয়েছে দুর্ভাগ্যক্রমে তার থেকে স্পষ্ট দেখা গেছে যে তিনি আর আসন্ন সংগ্রামের কথা চিন্তা করছেন না। মন্ত্রিমণ্ডলী এবং তাঁদের যে সমস্ত পরিচালক কংগ্রেসের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে আছেন, তাঁরাও সংগ্রামের কথা চিন্তা করেন না। এই রকম অবস্থায় দক্ষিণপন্থীদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে বাইরে ঐক্যের ঠাট বজায় রাখলে প্রকৃত প্রস্তাবে কংগ্রেসের ভিতরে গতিহীনতা এবং সংস্কার বিমুখতাকে চিরস্থায়ী করা হবে। আমরা এরকম করতে পারি না—আমাদের এরকম করা উচিতও নয়। সুতরাং বর্তমানে বামপন্থীদের পক্ষে দক্ষিণপন্থীদের থেকে পৃথক হয়ে নিজেদের শক্তি সংহত করবার সময় এসেছে। এই কাজটি সমাধা হলেই বামপন্থীরা কংগ্রেসের ভিতর সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে জাতীয় কংগ্রেসের নামে পুনরায় স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে পারবেন। এইটেই আজ বামপন্থীদের কর্তব্য। এই কর্তব্য পালনের জন্যই ফরওয়ার্ড ব্লকের সৃষ্টি হয়েছে।

১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসের পর থেকে সুভাষচন্দ্র ফরওয়ার্ড ব্লক সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। এই বছরেই আগষ্ট মাসে কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ এই মর্মে এক বিবৃতি প্রকাশ করেন—

কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি এই সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন যে তাঁর বিধি বহির্গত আচরণের জন্য ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাস থেকে তিন বর্ষকাল পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র বসু বঙ্গীয় কংগ্রেস সমিতির সভাপতি বা যে কোন নির্বাচিত কংগ্রেস সমিতির সভ্য হিসাবে অনুপযুক্ত বিবেচিত হলেন।

ওয়ার্ধা থেকে এই সংবাদ যখন তাঁর কাছে পৌছলো শোনা যায় তিনি বলেছিলেন—আর কিছু নেই?

সত্যিই আরও কিছু ছিল।

দক্ষিণপন্থী প্রভাবান্বিত কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ তাঁকে যে চোখেই দেখুক না কেন বাঙ্গালী কোনদিন তাঁকে দেশের শীর্ষস্থান থেকে একচুলও নড়াতে পারে নি। তাই কংগ্রেস অবৈধ বলে ঘোষণা করলেও বাঙ্গলা দেশ সুভাষচন্দ্রকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতিরূপে বরণ করে নিলে। ফলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি অবৈধ বলে ঘোষিত হল কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের তরফ থেকে এবং শরৎচন্দ্র বসু তার সঙ্গীগণ সহ কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হলেন।

ইতিমধ্যে যুদ্ধ সুরু হয়ে যাওয়ায় কংগ্রেস ও তার বৈদেশিক নীতির কিছুটা সংস্কার মানসে ওয়ার্কিং কমিটির এক অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রকে বিশেষ অতিথি হিসাবে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু সুভাষচন্দ্র সেখানে গিয়ে ব্যর্থ মনোরথে সভা ত্যাগ করে চলে এলেন। তাঁর আশা ছিল এই সুযোগে কংগ্রেস বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে চরম আঘাত হেনে একবারে চিরতরে বিধ্বস্ত করে দেবে। কিন্তু তাঁর মত এই অধিবেশনে গ্রাহ্য হল না। সদ্য চীন প্রত্যাগত জওহরলাল নেহরুই জয়ী হলেন।

সুভাষচন্দ্র সভা ত্যাগ করে এসেছিলেন বলে অনেকে তাঁর বিরুদ্ধ সমালোচনা করে। কিন্তু যারা বিরুদ্ধ সমালোচনা করে তারা জানে না নিজের মতবাদের ওপর সুভাষচন্দ্রের নিষ্ঠা কত গভীর। শুধু বাহ্যিক ও রাজনৈতিক জীবনে নয় ব্যক্তিগত জীবনের তুচ্ছ ঘটনার মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্যটুকু সহজেই চোখে পড়ে। নিজের মনের জোর এবং মতের জোর অক্ষুন্ন রাখবার জন্য তিনি জীবনে ধূমপান করেন নি।

১৯৪০ সাল কর্মবীর সুভাষচন্দ্রের জীবনের একটি কর্মবহুল অধ্যায়। এই বছর জানুয়ারী মাসে তিনি কোলকাতায় কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে একখানি বাড়ী নির্মাণ করবার পরিকল্পনা করেন। বিরাট এক জনতার সম্মুখে চিত্তরঞ্জন

এভেনিউতে রবীন্দ্রনাথ এই সৌধের ভিত্তিস্থাপনা করেন এবং নাম দেন মহাজাতি সদন। পরে অবশ্য পুলিশ এই বাড়ীর যাবতীয় অর্থভাণ্ডার এবং দলিল পত্র বাজেয়াপ্ত করে নেয়। তারপর শরৎ চন্দ্র বসু এই নিয়ে মামলা সুরু করেন সরকারের বিরুদ্ধে। যাই হোক এই মহাজাতি সদন এখনও অসম্পূর্ণ অবস্থায় বাঙ্গালীর আগামী দিনের সমস্ত আশা ভরসার প্রতীক স্বরূপ দাড়িয়ে আছে।

এই সময় তিনি কিছুদিনের জন্য যুক্তপ্রদেশ শফর করে বেড়ান। এবং মার্চ মাসে কংগ্রেস অধিবেশনের পাশাপাশি রামগড়ে আপোষ বিরোধী মহাসম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এপ্রিল মাসে তিনি কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান নির্বাচিত হন এবং কর্পোরেশনের মধ্যে মুস্লিম লীগের সঙ্গে একটা মীমাংসায় এসে পৌছান। মাসে পর পর ২৪ পরগণা জেলা খুব সম্মেলনে এবং ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগদান করেন। জুন মাসে নাগপুরে নিখিল ভারত ফরওয়ার্ড্ ব্লক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এবং ঐ মাসে ২০ তারিখে ওয়ার্ধায় মহাত্মাজীর সঙ্গে এবং ২২ তারিখে জিন্না ও সাভারকারের সঙ্গে দেখা করেন। ২৯শে জুন থেকে তিনি কোলকাতাস্থিত হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ নিয়ে তুমুল আন্দোলন সুরু করেন। দলে দলে ছাত্র হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এই আন্দোলনে যোগ দেয় এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মিথ্যা অপবাদের স্তম্ভ স্বরূপ হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারিত হয়। জুলাই মাসের ২ তারিখে এপ্রিল মাসে মহম্মদ আলি পার্কে প্রদত্ত এক বক্তৃতা ও ফরওয়ার্ড ব্লক পত্রিকায় (ফরওয়ার্ড ব্লক দল গঠনের সঙ্গে সঙ্গে এই পত্রিকার তিনি সম্পাদনা সুরু করেন) প্রকাশিত 'The Day of Reckoning' নামক এক প্রবন্ধের অজুহাতে ভারতরক্ষা বিধানে তিনি গ্রেপ্তার হন। কারাবাসের মধ্যেই অক্টোবর মাসে তিনি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। তারপর নভেম্বর ২৯ তারিখ থেকে তিনি অনশন ধর্মঘট সুরু করেন, যার ফলে কর্তৃপক্ষ ডিসেম্বর ৫ তারিখে তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। অনশন-ধর্মঘট সুরু করবার আগে বাংলার লাট

এবং মন্ত্রীমণ্ডলীর নিকট একখানি স্মরণীয় পত্র প্রেরণ করেন। সেই পত্রে তিনি লিখেছিলেন—

আমার নিজের সম্বন্ধে আমার যা কিছু বক্তব্য এখানে বলবো এবং কেন আমার জীবনের চরম পথে পা বাড়াচ্ছি তারও যুক্তিগুলো কাগজে কলমে একে একে প্রকাশ করবো।

আপনাদের কাছে সুব্যবহার প্রত্যাশা করবার আর কোন আশা নাই। তাই আমি দুটি অনুরোধ জানাচ্ছি—এদের মধ্যে দ্বিতীয়টি পত্রের শেষে জানানো হবে। আমার প্রথম অনুরোধ এই যে দয়া করে সরকারের দপ্তরে এই পত্রখানি রেখে দেবেন যাতে আপনাদের পরে আমার দেশবাসিগণের মধ্যে যাঁরা স্থলাভিষিক্ত হবেন তাঁরা এ পত্র পড়তে পারেন।

আমার প্রতি প্রকাশ্য অবৈধ ও অন্যায় ব্যবহার করা হয়েছে। এই অদ্ভুত ব্যবহারের একটি মাত্র ব্যাখ্যা আমার মনে লেগেছে যে সরকার আমার সঙ্গে স্পষ্টতই কোন দুবোধ্য কারণে শত্রুর মত প্রতিহিংসামূলক ব্যবহার করছেন।

আমার কি বর্তমান অবস্থা নীরবে সহ্য করে যা ঘটে তা গ্রহণ করবার জন্যে বসে থাকা উচিত—না যা আমার কাছে অসঙ্গত, অন্যায় এবং অবৈধ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উঠবো? অনেক পর্যালোচনার পর আমি স্থির করেছি যে এই অবস্থার নিকট আত্মসমর্পনের প্রশ্ন অবান্তর। অন্যায়কে চলতে দেওয়ার থেকে অন্যায়কে মেনে নেওয়া আরও বেশী পাপ। সুতরাং বিদ্রোহ আমি করবোই।

বর্তমান সময়ে যখন চারিদিকে প্রতিবাদ চলছে তখন সাধারণ পথ শেষ হয়ে গেছে। একটিমাত্র পথ শুধু বাকি—বন্দীর হাতে শেষ অস্ত্র—অনশন!

বর্তমান অবস্থায় জীবন আমার কাছে দুঃসহ। অন্যায় ও অধর্মের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জীবনের পরমায়ু ক্রয় করে নেওয়া আমার প্রতিটি অণু পরমাণুর বিরুদ্ধে।

আমি এই মূল্য দেওয়ার পরিবর্তে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। সরকার জোর করে আমায় জেলের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে চান তাহলে তার জবাবে আমি বলবো—আমায় ছেড়ে দাও আর না হয় আমি কিছুতেই বাঁচবো না—আমি বাঁচবো কি মরবো সেটা সম্পূর্ণ আমার হাতে।

এই মর জগতে সবই ধ্বংস হবে—কেবল আদর্শ, কল্পনা আর স্বপ্ন ধ্বংস হয় না। একটা আদর্শের জন্য একজন মানুষের মৃত্যু হতে পারে—কিন্তু তার মৃত্যুর পর সেই আদর্শ হাজার হাজার লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে।

আদর্শের জন্য বেঁচে থাকা এবং মৃত্যু বরণ করার চেয়ে আরও শান্তির বিষয় আর কি আছে?…এর থেকেই বলা যায় যে ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে মানুষ কখনও হারায় না। এই জগতে যদি সে কিছু হারায় তাহলে তার পরিবর্তে সে অমর জীবনের অধিকারী হতে পারবে।

এই হল আত্মার কৌশল। দেশ যাতে বাঁচতে পারে তার জন্যে এক একজন মানুষ প্রাণ দেবে। ভারতবর্ষ যাতে বাঁচতে পারে এবং স্বাধীনতা ও গৌরবের অধিকারী হতে পারে তার জন্য আজ আমি প্রাণ বিসজন দোব।

আমি আমার দেশবাসিদের বলছি—ভুলো না যে পরাধীন থাকা সবচেয়ে বড় অভিশাপ। অন্যায় এবং অধর্মের সঙ্গে আপোষ—তার থেকে বড় পাপ আর নেই।

আজকের সরকারকে আমি বলছি তোমার সাম্প্রদায়িক এবং অন্যায় পথের উন্মত্ততা এখনও থামাও। তোমার ফিরবার সময় এখনও আছে। ব্যুমেরাং এর আশ্রয় নিয়ো না যেটা তোমার ওপরই ফিরে আসবে।

আমার শেষ হয়েছে। আমার দ্বিতীয় ও শেষ অনুরোধ আমার শান্তিপূর্ণ শেষ জীবনে আপনারা জোর করে বাধা দেবেন না। ম্যাকস্যুইনী, যতীন দাস, মহাত্মাগান্ধী ও ১৯২৬ সালে আমাদের বেলায় সরকার অনশন ভঙ্গ করতে চেষ্টা

করেন নি। আমি আশা করি এবারেও তাঁরা তাই করবেন। যদি না করেন তাহলে আমাকে জোর করে খাওয়াবার সামান্যতম চেষ্টাও আমার পূর্ণ শক্তি দিয়ে প্রতিহত হবে—যদিও তার ফলাফল আরও বিষময় এবং আরও ভয়ানক হতে পারে—যা হোত না। ২০শে নভেম্বর ১৯৪০ থেকে আমি অনশন আরম্ভ করবো।

*   *   *   *   *

এর পর জীবন নয়, শুধু স্বপ্ন

দিল্লী চলো

ঝড়ের আগে

বাঙ্গালীর মনে আছে ২৬শে জানুয়ারী ১৯৪১, কত বড় এক শুভদিন। সেদিন প্রথম ঘোষণা করা হল সুভাষবাবু তাঁর শয্যাগৃহ থেকে রহস্যজনকভাবে অন্তর্ধান করেছেন। কিছুদিন ধরেই তিনি তৈরী হচ্ছিলেন এই বিরাট এক আদর্শের সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার জন্যে। কিন্তু সে খবর কেউ জানতো না। তাই তাঁর এই রহস্যজনক অন্তর্ধানে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেল। সকলের মুখে এক কথা প্রহরী বেষ্টিত গৃহ থেকে কি করে তিনি উধাও হয়ে গেলেন? শুধু তাঁর নিজের বাড়ী নয় যখন জানা গেল যে সমগ্র ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে জার্মান বা জাপানে তিনি গিয়ে হাজির হয়েছেন তখন শুধু ভারতবাসী নয় সমগ্র বিশ্বে একটা চাঞ্চল্য পড়ে গিয়েছিল; ব্যাপারখানা কি? ২৫০ বছরের দাসত্ব করার পরও এরকম বিপ্লবী বীরের জন্ম হয় কোন শক্তির বলে? কেন হয়? আধুনিক

বৈজ্ঞানিক জগতে যেখানে বিজ্ঞানবলে এক দেশের নিভৃত ষড়যন্ত্রও অন্যদেশে অতি সহজেই প্রকাশ পেয়ে যায় সেই জগতের ওপরেই এক দেশের মানুষ তার শত্রুপক্ষের দেশে গিয়ে হাজির হল, কেউ বাধা দিতে পারলো না, এ সম্ভব হয় কোন মন্ত্র বলে ?

এ কথা সত্যি ব্যাপারটা যাদু নয়, মন্ত্র বলও নয়। সত্যিকারের যে সাধক তার মনের মধ্যে সাধনার বলে এমন একটা শক্তি সুপ্ত হয়ে থাকে যে যখন তাকে জাগ্রত করা যায় তখন সে অসাধ্য সাধন করতে পারে। সুভাষবাবু নিজে মান্দালয় জেল থেকে লিখেছিলেন, যেদিন প্রস্তুত হব সেদিন এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে কেহ আটকে রাখতে পারবে না। সুভাষবাবুর এই অন্তর্ধানের মূলে আছে এই প্রস্তুত হওয়ার সংকেত।

একেবারে ছাত্রাবস্থা থেকেই আমরা দেখেছি সুভাষচন্দ্রের সংগঠনীশক্তি অসীম। যে কোন অবস্থাতেই হোক আর যে পরিমাণ সঙ্গতি নিয়েই হোক তিনি সব সময়েই কোন প্রতিষ্ঠান, কোন দল, বা কোন পরিকল্পনাকে গড়ে তুলতে পারতেন। তাই তিনি যে শত্রুপক্ষের সঙ্গে একটা যোগাযোগের ব্যবস্থা করে নিজের কার্যসিদ্ধি করতে পারবেন এ বিষয়ে খুব বেশী আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তবে চারিদিকে কড়া পাহারা, সেন্সার ও সামরিক বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে তিনি কি ভাবে যে সফলকাম হতে পারলেন সেইটিই সমস্ত জগতের সামনে সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। তবে স্পর্শমণি যা কিছুই স্পর্শ করে তা সোনা হয়ে যায়, এতে কোন ভুল নেই।

তবু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে সুভাষবাবু যে ভাবে এবং যে দেশেই গিয়ে থাকুন এদেশের তাঁর একান্ত বিশ্বাসী কয়েকজন সহচরের সাহায্য তাকে নিশ্চয়ই নিতে হয়েছিল, নতুবা এ কাজ একা সম্ভব নয়। অবশ্য, তাঁর অন্তর্ধানের পর সরকার পক্ষ থেকে বহু চেষ্টা হয়েছে এঁদের ধরবার। বহু ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মী, সুভাষবাবুর বাড়ীর লোকেরা, যেমন শিশির বসু, অরবিন্দ বসু

অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করেছেন জেলের মধ্যে, শরৎ বাবু অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারাবাস ভোগ করে তিলে তিলে স্বাস্থ্যক্ষয় করেছেন, এমন কি সৌম্যঠাকুর পর্যন্ত বাদ যান নি, কিন্তু তবু একথা গর্বের সঙ্গে বলা যেতে পারে যে সরকার পক্ষ তিলমাত্রও সফলকাম হতে পারেন নি। এতটুকু কোন সংবাদ কখনও কোনও অসতর্ক মুহূর্তেও সেই একনিষ্ঠ সেবকদের মুখ দিয়ে বার হয় নি। এইখানেই সুভাষবাবুর নেতৃত্বের ও জনপ্রিয়তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

এই রোমাঞ্চকর কাহিনী হয়ত শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অশ্রুতই রয়ে যেত জগতের কাছে, যদি না আকালী নেতা মাষ্টার তারা সিং সেদিনকার বিবৃতিতে কিছু কিছু সংবাদ প্রকাশ করে দিতেন সে কাহিনী যেকোনও জগতের রোমাঞ্চকর কাহিনীর চেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ। যে বাঙ্গালীর ভীরু, কাপুরুষ আর আরামপ্রিয় বলে বদনাম আছে এ সেই বাঙ্গালী জাতিব মধ্যেই এক আবাল্য ঐশ্বর্য-প্রতিপালিত যুবকের আত্মকাহিনী। হে জগতবাসী সুভাষচন্দ্রের মুখের দিকে—সংহত বাঙ্গালী যৌবনের দিকে চেয়ে সে কথা শোনো। অবশ্য বিশদ বিববণ আমরা এর থেকে পাবো না কারণ বিশদ বিবরণ সুভাষবাবু নিজেই প্রকাশ করেন নি। তিনি নাকি বলেছিলেন—অবশ্য শোনা কথা—যে, এ পথ তাঁকে ভবিষ্যতে আবার হয়ত গ্রহণ করতে হতে পারে, তাই তিনি সমস্ত প্রকাশ করতে রাজী নন। যাই হোক শিখ নেতা তারা সিং যে খবর আমাদের দিয়েছেন তাই আপাততঃ শুনে আমাদের সন্তুষ্ট হতে হবে।*

তারা সিং বরাবরই সুভাষবাবুর মতের ওপর বিশ্বাসী এবং তিনি সুভাষবাবুকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন। তাই সুভাষবাবু যখন ছাড়া পেয়ে অসুস্থ অবস্থায় বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন তখন তারা সিং তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। মনে মনে তাঁর তখন এই বিরাট স্বাধীনতা-যজ্ঞের পরিকল্পনা চলছিল। যাই হোক এই সময়ে তিনি তারা সিংএর কাছে বলেন যে এই হচ্ছে সুযোগ। একদিকে বৃটিশ

* এরপর উত্তমচাঁদের কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

যখন ধ্বংস হতে চলেছে অন্যদিকে শত্রুপক্ষ খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এই সময়ে তাদের সাহায্য নিয়ে যদি বৃটিশকে পরাজিত করতে পারা যায় তাহলে ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই স্বাধীনতা লাভ করবে। ভারতবর্ষ বৈদেশিক শক্তির সাহায্য ছাড়া স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে না। তারা সিং এতে আপত্তি জানিয়েছিলেন এই বলে যে, ভারতবর্ষ হয়ত এই উপায়ে জয়লাভ করতে পারে কিন্তু ভবিষ্যতে হয়ত সেই বৈদেশিক শক্তি ভারতীয়দের নিজেদের হুকুম মত চালাতে সুরু করতে পারে, তার ফলে স্বাধীনতা লাভ হবে না কেবল শাসকের পরিবর্তন হবে মাত্র। সুভাষবাবু জবাব দিলেন, বিপদ সব সময়েই থাকবে কিন্তু আমরা বিপদের ঝুঁকি নিতে কখনই কুণ্ঠিত হব না; আমরা আমাদের সঙ্কল্প সিদ্ধ করতে পারি। তারপর তারা সিংএর ওপর আস্থা দেখিয়ে বলেন, বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত শিখ সৈন্যেরা আপনাকে শ্রদ্ধা করে এবং তারা সরাসরি আপনার অনুগত। শিখেরা বীর জাতি, আমি আশা করি ভবিষ্যতে যখন প্রয়োজন হবে, ডাক যখন আসবে তখন শিখেরা আমাকে সাহায্য করবে, আমার পাশে এসে দাঁড়াবে। উত্তরে তারা সিং জানান যে সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন, শিখেরা সববিষয়ে তাঁর আদেশ অনুসরণ করে যাবে।

তারপর তাদের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা চলে। শেষে সুভাষ বাবু জানান যে তাঁর কাছে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক সুভাষবাবুর বাণী বহন করে নিয়ে আসবে এবং 'ফরওয়ার্ড ব্লক' এই সাঙ্কেতিক শব্দ উচ্চারণ করলেই তাঁকে বিশ্বাস করে আদেশ মত কাজ যেন তিনি করেন। এবং তারা সিং একথাও জানিয়েছেন যে তারপর সুভাষবাবু যখন কাবুলের পথে ভারত ত্যাগ করছিলেন সেই সময়ে সত্যিই এক ভদ্রলোক 'ফরওয়ার্ড ব্লক' বলে তাঁর কাছে এসেছিলেন।

সম্প্রতি সুভাষবাবুর পলায়ন সংস্পর্শে থাকার দরুণ একজন ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাঁর কাছে অনেক খবর পাওয়া গেছে। তাঁর মতে আসলে ১৯৪০ সালের ১৩ই ডিসেম্বর সুভাষবাবু কোলকাতা পরিত্যাগ করেন। তিনি প্রথমে

মোটর যোগে বর্ধমান পর্যন্ত যান সেখান থেকে পাঞ্জাব মেলে একখানা সেকেণ্ড ক্লাস রিজার্ভ কামরা করে পাঞ্জাবে গিয়ে হাজির হন। কি অসম্ভব কাণ্ড! স্বভাষবাবু আপনার আমারই মত পাঞ্জাব মেলে চড়ে 'যুদ্ধ' করতে চলেছেন! কিন্তু তাঁকে চেনবার জো নেই একেবারে। মুখে তাঁর বিরাট দাড়ি গোঁফ, মাথায় পাগড়ী—দেখলে মনে হবে বিরাট এক পাঠান চলেছে বুঝি! যাই হোক পেশোয়ারে গিয়ে তিনি ছ'দিন ছিলেন খান আব্বাসখানের আশ্রয়ে। পেশোয়ার থেকে একজন দেহরক্ষীর সঙ্গে তিনি কাবুল যাত্রা করলেন। পাঁচ মাইল পর্যন্ত পেশোয়ারী টোঙ্গায় আর তারপর বাকী রাস্তা পায়ে হেঁটে তিনি কাবুল এসে পৌঁছলেন। কাবুলে পৌঁছে কিন্তু তিনি বিপদে পড়েন। হঠাৎ তিনি আমাশয় রোগে পড়েন এবং সেই অসুস্থ অবস্থায় একজন গোয়েন্দার পাল্লায় পড়েন। শেষে দশটা টাকা ও তাঁর সঙ্গের ফাউণ্টেন পেনটা তাকে দিয়ে তবে উদ্ধার পান। যুদ্ধ জয় করতে হলে ছল বল কৌশল এ তিনেরই আশ্রয় নিতে হয়, শুধু বলে সব ক্ষেত্রে চলে না।

কাবুল থেকে তিনি রাশিয়ায় যাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু রাশিয়া সরকার জানান যে, রুশ-জার্মাণ চুক্তি ভাঙ্গতে চলেছে এবং শীঘ্রই বৃটিশের সঙ্গে তাদের চুক্তি হবে সুতরাং বৃটিশের পক্ষে ক্ষতিকর কোন কাজ তারা করতে পারে না। এর পর তিনি একজন জার্মানের সংস্পর্শে আসেন, এবং তিনি ভারতের বাইরে যেতে চাইছেন জেনে সেই জার্মান ভদ্রলোক বার্লিনের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দেন। এবং স্বভাষবাবু রাশিয়ার সীমানার ওপর দিয়ে বিমান পথে বার্লিনে গিয়ে পৌছান।

এই হল মোটামুটি ইতিহাস। আমরা পূর্ণ বিবরণ না পেলেও যে সব ভাগ্যবান দেশ প্রেমিকের দল যারা স্বভাষবাবুকে এই ব্যাপারে সর্বদিক দিয়ে সাহায্য করেছেন সেই অখ্যাতনামা বন্ধুদের আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই।

ঐ একই ব্যক্তির কাছ থেকে খবর পাওয়া গেছে যে স্বভাষবাবু ১৯৩৯ সালে

নাকি একবার ভারত থেকে পলায়ন করবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কৃতকার্য হন নি। এবং তার কারামুক্তির পর নভেম্বর মাসে কোলকাতার নাম করা সাংবাদিক —'দেশ দর্পণ' সম্পাদক সর্দার নিরঞ্জন সিং তালিবের নিকট তাঁর রাশিয়া যাওয়ার সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ করেন। তালিব বলেন আচারসিং চিন্না এই বিষয়ে বেশী সাহায্য করতে পারবেন। চিন্না তখন ফতেওয়াল হত্যা মামলায় আত্মগোপন করে বেড়াচ্ছেন। তারপর সুভাষ-তালিব-চিন্না বৈঠকের একটা আয়োজন হয়েছিল। এই বৈঠকে স্থির হয় চিন্না ও তালিব পাঞ্জাবে গিয়ে আকালী ও কমিউনিষ্টদের মধ্যে একটা ঐক্যের চেষ্টা করবেন। তাঁরা দুজনেই পাঞ্জাবে গেলেন এবং কমিউনিষ্ট ও আকালীদের মধ্যে কথাবার্তা চালাতে লাগলেন। স্থির হল কমিউনিষ্টরা সুভাষবাবুকে রাশিয়ায় পাঠাবার ব্যবস্থা করবে আর আকালীরা পাঞ্জাবের গুরুদ্বারের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপাবে কমিউনিষ্টদের আস্থা স্থাপনের যোগ্য হয়ে উঠবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হয় নি। তবে ইতিমধ্যে সুভাষবাবু অন্তর্ধান করলেন। এবং এই ব্যাপারে পাঞ্জাবই তাকে নানাদিক দিয়ে সাহায্য করলো।

সত্য মিথ্যা বিচার এবং প্রকৃত তথ্য উদঘাটনের সময় এখনো আসে নি, কিংবা সময় এলেও সুযোগ এখনও ঘটেনি তবে সুভাষবাবুর অন্তর্ধান বিষয়ে এই হল একমাত্র খবর। জানা গেছে অধুনা মুক্ত উত্তমচাঁদও নাকি এই ব্যাপারে জড়িত আছেন। তবে একথা অনুমান করা অযৌক্তিক নয় যে সুভাষবাবু স্থলপথে এবং কাবুলের পথেই ভারত ত্যাগ করেছিলেন। আগামী দিনের স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে সেই জয়যাত্রার পথের মানচিত্র স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকবে।

এ ত গেল যাত্রাপথের বিচ্ছিন্ন ও প্রক্ষিপ্ত কাহিনী। এবার লক্ষ্যের কথা, যাত্রাস্থানের কথা। ১৯৪১ সালের ১০ই নভেম্বর ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব স্মিথ্ ঘোষণা করলেন সুভাষচন্দ্র বার্লিন বা রোমে অবস্থান করছেন। ১৭ তারিখে অক্ষশক্তি পক্ষের বেতারে জানা গেল সুভাষবাবু জার্মাণীতে এসে জার্মান সরকারের

সঙ্গে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন। ২৭ তারিখে ভারত-সচিব আমেরী বললেন স্থভাষবাবুর সঠিক অবস্থান সম্বন্ধে জোর দিয়ে কিছু বলা চলে না।

স্থভাষবাবুর গৃহ পরিত্যাগের পর তাঁর শয্যাগৃহে বাঘছাল ও গীতা পাওয়া গেল। তাছাড়া কিছুদিন ধরে তিনি নির্জনে দিন কাটাচ্ছিলেন, ফলের রস ছাড়া কিছু খেতেন না, সব সময়েই ধ্যানে কাটাতেন। স্থতরাং লোকে মনে করেছিল যে তিনি হয়ত রাজনৈতিক জীবনে বীতরাগ হয়ে শ্রীঅরবিন্দের মত ধর্ম জীবনের পথে যাত্রা করেছেন। এমন ধারণা করা খুব বিসদৃশ নয় কেন না বরাবরই তাঁর মনে ধর্মভাবের প্রাবল্য খুব বেশী। তাই লোকে প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারে নি যে, তিনি জার্মানীতে গিয়ে হিটলারের সঙ্গে কোন গোপন ষড়যন্ত্র করছেন। কিন্তু সরকার পক্ষ থেকে হঠাৎ খুব প্রচার চলতে লাগলো এই ষড়যন্ত্রের। বিশেষ করে স্টেট্‌স্‌ম্যান প্রমুখ সংবাদপত্রে লেখা হতে লাগলো যে স্থভাষচন্দ্র ফিফ্‌থ্‌ কলমিষ্ট, শত্রুপক্ষের দালাল, ফ্যাসিস্ত, দেশদ্রোহী ইত্যাদি। এমন কি তারা লিখলে যে, স্থভাষবাবু বরাবরই ফ্যাসিস্ত ডিক্টেটরদের কাছ থেকে ভারতে ফিফ্‌থ কলম বা পঞ্চম বাহিনী গঠন করবার জন্যে অর্থ সাহায্য পেয়ে আসছেন। আচার্য কৃপালনী এই মিথ্যা দোষারোপের বিরুদ্ধে এক বিবৃতি দিয়েছিলেন।

এই নিয়ে বাদানুবাদ চলছে এমন সময় ২৮শে মার্চ ১৯৪২ রয়টার লণ্ডন থেকে ঘোষণা করলেন যে, টোকিওর সংবাদে প্রকাশ স্থভাষবাবু জাপানের সমুদ্রতীরে এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। স্থভাষবাবু নাকি টোকিওতে স্বাধীন কংগ্রেসে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। তার সঙ্গে তাঁর কয়েকজন পার্শ্বচরও নিহত হয়েছেন।

এই মর্ম্মান্তিক সংবাদে সমস্ত দেশ সচকিত হয়ে উঠলেও মর্মাহত হল না। কারণ, স্থভাষবাবুর এই মৃত্যু-সংবাদ অন্তর থেকে কেউ বিশ্বাস করতে পারে নি।

৯ই এপ্রিল স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ঘোষণা করলেন যে সুভাষবাবু অক্ষশক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন এবং ইউরোপে অবস্থানকালে আজাদ হিন্দ ফৌজের শাখা গঠন করেছেন।

মোট কথা এ কথাটা স্পষ্ট করে জানা গেল যে সুভাষবাবু অক্ষশক্তির সঙ্গে যোগ দিয়ে বিরাট একটা পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করছেন।

স্বাধীনতার জাহ্নবীধারাকে অপার্থিব স্বপ্ন-রাজ্যের স্বর্গ থেকে বাস্তবের মাটিতে —শৃঙ্খলিত ভারতভূমিতে নামিয়ে আনতে কোন দুর্গমে তপস্যা সুরু করেছে বিংশ শতাব্দীর ভগীরথ— !

১৯৪৩ সালের মে/জুন মাসে সম্ভবতঃ সাবমেরিণযোগে সুভাষবাবু জাপানে প্রেরিত হন। ৭ই জুলাই চুংকিং সংবাদে তাঁর সিঙ্গাপুরে অবস্থানের কথা প্রথম ঘোষিত হয়।

এর পর থেকেই আজাদ-হিন্দ-ফৌজের গৌরবময় ইতিহাসের সুরু। কিন্তু সে ইতিহাসের গর্বিত অধ্যায়ের আগে আমাদের তদানীন্তন পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর অবস্থা সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা থাকা দরকার। কারণ এই প্রপীড়িত হতভাগ্য ভারতীয়দের এবং অন্যান্য স্থানীয় অধিবাসীদের নির্মম জীবনকাহিনীর মসীলিপ্ত পটভূমিকাতেই স্বপ্নোজ্জ্বল সূর্যোদয় সম্ভব হয়েছিল।

কিছুক্ষণের জন্য অতীতের সেই কালো ইতিহাসে আমরা নেমে চলি। সেই কালো ইতিহাসের পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘেই ত বিপ্লবের ঝড় উঠবে !

এত অল্পদিনের মধ্যে এতবড় একটা কাহিনী যে গড়ে উঠতে পারলো তার মূলে আছে সুভাষবাবুর অসাধারণ কর্মক্ষমতা এবং যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের অতুলনীয় আত্মত্যাগ সন্দেহ নেই, কিন্তু তার মূলে আছে আরও একটি বড় বস্তু যার ফলে এই অভিযান এত সহজে সম্ভব হতে পেরেছিল। সে বস্তুটি হল মালয় ও ব্রহ্মদেশের প্রবাসী ভারতীয়দের ঐকান্তিক সহযোগিতা। এই যে আন্তরিক

সহযোগিতা এরও আবার মূলে আছে একটি বস্তু যার ভার জগদ্দল পাথরের মত সম অংশে চাপ দিয়ে আছে ভারতে এবং এই দেশে—সে হল শ্বেত বর্বরতা। আমাদেরই মত স্থানীয় ভারতীয়েরা বৃটিশের অত্যাচারে নিপীড়িত নিষ্পেষিত। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ সুরু হবার আগে এবং যুদ্ধের প্রথম বৎসরে অকথ্য নির্যাতন এদের সহ্য করতে হয়েছে বৃটিশের হাতে। এখানে খনিজ এবং উদ্ভিজ্জ উৎপাদনের ব্যবসায়ে শ্বেতাঙ্গদের যথেষ্ট স্বার্থ আছে এবং সেইজন্যেই সকলরকম উপায়ে তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এই দেশকে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখতে হয়। তাই ভারতীয়দের একহাতে সমস্ত সম্পদ তুলে দিতে হয় এই বর্বর শাসকদের হাতে আর অন্য হাতে গ্রহণ করতে হয় নির্যাতন ও অত্যাচারের ক্লেশ। এদিকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ এসে পৌঁচেছে এদের মনে। এদেরও মনে বহুদিনকার ঘুমিয়ে-পড়া আশার সূর্য আবার জেগে উঠছে ধীরে ধীরে। তাই তারা যে সুযোগ বুঝে আজাদ-হিন্দ-ফৌজে এসে যোগ দেবে—সহায়তা করবে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

তাদের ওপর এই জুলুম এবং তার পরিবর্তে তাদের ক্ষুব্ধ মনের আন্দোলন সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ছবি আমরা দেখতে পাবো ১৯৪১ সালের শ্রমিক আন্দোলনে। এ আন্দোলন সম্পূর্ণ অহিংসাভাবেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রমিকদের দাবী ছিল—(১) জীবনযাত্রার অতিরিক্ত ব্যয়বৃদ্ধির জন্য চীনাদের সহিত সমান হারের মাহিনা। (২) সংবাদপত্র পড়ার স্বাধীনতা (৩) আমন্ত্রিত ভারতীয় নেতাদের অধীনে সভা আহ্বানের স্বাধীনতা (৪) বাইরের থেকে আত্মীয়বন্ধুদের বাড়ীতে আনবার অধিকার (৫) সমস্ত তাড়ির দোকানের উচ্ছেদসাধন (৬) উপযুক্ত শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা (৭) এমন সব সংস্কার ব্যবস্থা করা যাতে জগতের লোক জানতে পারে তারাও মানুষ (৮) উচ্চপদে নিয়োগ····· ইত্যাদি।

বৃটিশ শাসক এর প্রত্যুত্তর দিয়েছিল। ভাষায় নয় কাযে। যথা—(১) ধর্মঘটীদের ওপর গুলীবর্ষণ (২) নারীদের বলপূর্বক উলঙ্গ করে রাস্তায় রাস্তায় তাড়া

করে বেড়ানো (৩) নারীদের ওপর পাশবিক অত্যাচার (৪) প্রায় ৫০০০০ শ্রমিককে গৃহহীন করা (৫) সমস্ত জল আলো বন্ধ করে দেওয়া…ইত্যাদি। অথচ, সেন্সারের এমনই কড়া ব্যবস্থা ছিল যে, জগতের কোথাও এ খবর গিয়ে পৌছতে পারে নি।

এদিকে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ সুরু হয়ে গেছলো। ভেতরে ভেতরে সমস্ত শ্বেতাঙ্গ অধিবাসিদের সরাবার ব্যবস্থা হতে লাগল। ১৯৪১ সালের শেষ দিকে সমস্ত বৃটিশই পালিয়ে গেল মালয় ছেড়ে।* আর জাপানীদের সমস্ত আক্রমণের সমস্ত চাপ বহন করবার জন্যে রইল অরক্ষিত হতভাগ্য ভারতীয়েরা। উপরন্তু জল ও আলোর সমস্ত ব্যবস্থা ধ্বংস করে গিয়েছিল বৃটিশেরা। সুতরাং ভারতীয়দেব দুর্দশা অবর্ণনীয় রকমের মর্মান্তিক সন্দেহ নাই। কিছু কিছু ভারতীয় সৈন্যও এখানে ছিল।

জাপানীরা ১৯৪২ সালের ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে সমস্ত মালয় দখল করে বসে। তারা কিন্তু ভারতীয় অধিবাসী ও সৈন্যদের ওপব কোনরকম খারাপ ব্যবহার করেনি! উপরন্তু ভারতের স্বাধীনতার জন্য দল গঠনে সবরকম সাহায্য করেছিল ও সুযোগ সুবিধা দিতে কুণ্ঠিত হয়নি। এমন কি তারা সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত করে দেয়।

এদিকে জাপানে রাসবিহারী বসু ভারত স্বাধীনতা সঙ্ঘ বা Indian Independence League গঠন করে বিরাট এক আন্দোলন কয়েক বৎসর যাবৎ চালনা করছিলেন। এই আই. আই. এলএর অনুকরণে মালয়েতেও লীগ গড়ে উঠলো। জাপানের সহযোগিতায় তাদের শক্তিও দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। তবে সকলেই যে এতে যোগ দিয়েছিল তা নয়। বৃটিশের গুপ্ত সহযোগিতায় গুপ্তচরদের নিয়ে এবং পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে অন্যান্য সাধারণ লোককে নিয়ে এক জাপ-বিরোধী বাহিনীও গড়ে উঠলো। জাপানীরা এদেরও

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

কোন বাধা দেয়নি। এ বিষয়ে জাপানের মনোভাব সত্যিই বিস্ময়কর। এদের সংখ্যাও নেহাৎ কম ছিল না। তারা রীতিমত মিত্র শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করতো।

ধীরে ধীরে যখন পূব-এশিয়া জাপানীরা জয় করে ফেললে তখন সারা পূব-এশিয়া জুড়ে ভারত-স্বাধীনতা সঙ্ঘ গড়ে উঠেছে। এই দলের ব্রহ্ম, শ্যাম, মালয়, সাংহাই, ফিলিপিন, কোরীয়া, মাঞ্চুরিয়া, আন্দামান, হংকং, নানকিং ও জাপানের প্রতিনিধিদের নিয়ে রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে ব্যাংককে এক অধিবেশন বসলো। এই অধিবেশনে সমস্ত পূব-এশিয়া সঙ্ঘের একটা কার্যতালিকা ও কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করা হল। সভাপতি হলেন, রাসবিহারী বসু, এবং চারজন সভ্য হলেন: এন, রাঘবন, কে, পি, কে, মেনন, ক্যাপ্টেন মোহন সিং ও কর্ণেল জিলানী। মোহন সিংয়ের ওপর ভার পড়লো সংগঠনের। তিনিই প্রথম আজাদ-হিন্দ-ফৌজ বা জাতীয় সেনা বাহিনী বা Indian National Army গঠন করেন।

এই দিক দিয়ে এই পাঁচজন বীর সন্তান—আধুনিক যুগের পঞ্চ-পাণ্ডব আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রণামের পাত্র!

অবশ্য এই বাহিনীর অস্তিত্ব বেশী দিন ছিল না। ওঁরা দেখলেন জাপানের উদ্দেশ্য এই সৈন্যদের দিয়ে তাদের কার্যসিদ্ধি করা। ফলে মোহন সিং ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে এই বাহিনী ভেঙ্গে দিলেন এবং ওঁদের কার্যনির্বাহক সমিতিও ভেঙ্গে গেল। কিন্তু রাসবিহারী বসু তখনও হাল ছাড়েন নি। তিনি একাই শেষপর্যন্ত লীগের কাজ চালাতে লাগালেন এবং কর্ণেল ভোঁসলে নতুন করে জাতীয়-সেনা-বাহিনী গঠন করতে আরম্ভ করলেন।

ঠিক এই সময়েই সুভাষবাবু জার্মানী থেকে এসে উদয় হলেন টোকিওয়। সূর্য উদয়ের দেশে সূর্য উদিত হলেন পশ্চিম পার হয়ে। সেই সূর্য ক্রমশঃ গড়িয়ে চললো মধ্যাহ্নের দিকে।

টোকিও থেকে সিঙ্গাপুর !

পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের স্তূপে ঝলসে উঠলো বিদ্যুৎ।

টোকিও রেডিও থেকে প্রথম যে বেতার বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন, তাতে বলেছিলেন, 'আমার এ কথায় বিশ্বাস করুন যে আমি ভারতেরই উদ্দেশ্যে একজন ভারতীয়। পাখীদের মধ্যে কাক হল সবচেয়ে ধূর্ত ও নিষ্ঠুর, পশুদের মধ্যে শৃগাল আর মানুষের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ জাতি। এই বৃটিশ যদি আমাকে প্রলোভিত করতে না পেরে থাকে তাহলে জগতে আর কোনও শক্তি নেই যে তা পারে। তাহলেও আপনাদের মনের সন্দেহের কথা আমি অনুভব করি। আমি পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের ডাক দিয়ে বলছি আপনারা আমাদের মাতা হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা উদ্ধারের মহৎ কার্যের উদ্দেশ্যে একই পতাকার তলে সমবেত হ'ন। ভারতবর্ষ এক দেশ। ভারতবাসী এক জাতি। আমাদের একমাত্র পতাকা ত্রিবর্ণ পতাকা। আমাদের একমাত্র শত্রু বৃটেন। দিল্লীর দিকে এগিয়ে চলুন এবং লাল কেল্লার ওপর ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করুন। আমি আশা করি আপনারা হিন্দুস্থানের শৌর্য ও বীর্যের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখবেন।

১৯৪৩ সালের জুলাই মাসের চার তারিখে সিঙ্গাপুরের ক্যাথে বিল্ডিং অপূর্ব-ভাবে সজ্জিত হল। প্রায় পাঁচ হাজার প্রতিনিধি এসে মিলিত হলেন এই প্রাসাদে! একজন ভারতীয় প্রায় এক লক্ষ টাকা দিয়ে একখানা আসন সংগ্রহ করলেন।

লক্ষ লক্ষ ভারতীয় ও অভারতীয় নরনারী জড় হলেন অট্টালিকার চারদিকে। তাদের উদ্দেশ্য একটিবার মাত্র দর্শন করবেন এই রহস্যময় লোকটিকে! কে এই বিপ্লবী বীর? কোথাকার ভারতবর্ষের কোন এক গৃহ হতে বার হয়ে পশ্চিম প্রদক্ষিণ করে কোন সে সাহসী যুবক এসে দাঁড়িয়েছে স্বাধীন ভারতের প্রথম উদয় তীর্থে?

এই অগণিত জনতার সম্মুখে দুঃখিনী বাংলা মায়ের শ্রেষ্ঠ রত্ন বঙ্গবীর সুভাষচন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন, যেমন করে কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগে পশ্চিমের সমস্ত দুর্যোগের সামনে প্রহরীর মত বুক পেতে দাঁড়িয়ে উঠেছিল হিমশীর্ষ হিমালয়।

চিত্তজয়ী স্বরে বলে উঠলেন তিনি,—ইতিহাস বিখ্যাত বীর ভারতীয়ের বংশধর আপনারা। আপনারা আর দাস নন। আমি চাই আপনারা মাথা উঁচু করে কথা বলুন। আমাদের শ্রেষ্ঠ নেতা গান্ধীজীর প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি বলছি অস্ত্র দিয়ে অস্ত্রকে ঠেকাতে হবে। ভীরু দাসত্বের জীবনের চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়! আমরা যদি এক লক্ষ প্রাণ বলিদান দিতে পারি তাহলে আমরা আমাদের চল্লিশ কোটি ভাই বোনদের বৃটিশের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে পারবো।

তারপর আবার ৭ই জুলাই তিনি ঘোষণা করলেন,—কেন, কিসের আহ্বানে সব রকম বিপদসঙ্কুল পথে ঘর ছেড়ে আমি বেরিয়ে পড়লুম সে কথা আমি প্রকাশ করে বলতে চাই। অপানারা জানেন ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী পার হওয়ার পর থেকেই আমি স্বাধীনতার যুদ্ধে রত আছি। গত বিশ বৎসর ধরে সমস্ত অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে আমি বরাবরই জড়িত আছি। তার ওপর হিংস হোক আর অহিংস হোক, যে কোন রকমের গোপন বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে আমি যুক্ত আছি এই সন্দেহে বার বার বিনা বিচারে আমি কারাবাসে পতিত হয়েছি।

এই অভিজ্ঞতার ফলে আমি এই উপসংহারে এসে পৌছেছি যে, ভারতের মধ্যে যত শক্তিই আমরা প্রয়োগ করি না কেন তা দিয়ে বৃটিশকে তাড়ানো যাবে না। যদি গৃহের সংগ্রাম আমাদের দেশবাসীর স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষে যথেষ্ট হত তাহলে বোকার মত এই অপ্রয়োজনীয় বিপদ ও অনিশ্চয়তার মধ্যে আমি ঝাঁপিয়ে পড়তাম না।

সহজ ভাষায় বলতে আমার ভারত ত্যাগের কারণ দেশের ভেতরকার সংগ্রামকে আরও শক্তিশালী করে তোলবার জন্যে বাইরে থেকে সাহায্য করা।

এই বৈদেশিক সাহায্য—যা আমাদের দেশের জরুরী প্রয়োজন আছে সেই সাহায্য ব্যতিরেকে ভারতের স্বাধীনতা অসম্ভব। অপরপক্ষে এই সাহায্য—দেশ যার প্রয়োজন বোধ করছে তার প্রয়োজন প্রকৃতপক্ষে অতি সামান্য। কারণ অক্ষশক্তি বৃটিশকে যেভাবে পরাজিত করেছে তাতে বৃটিশের শক্তি এবং সম্মান এমনই শিথিল হয়ে গেছে যে, আমাদের কাজ আগের তুলনায় যথেষ্ট সহজ হয়ে এসেছে।···

এমনি করেই চললো বাণীর পর বাণী, ডাকের পর ডাক!

এর পর—ঝড়!—

* * * *

এবার তবে ঝড়

পূর্বেই বলা হয়েছে যে জাপানীদের কারসাজির কথা জানতে পেরে জাতীয় সেনা-বাহিনী ভেঙ্গে দেওয়া হয়। কিন্তু তবু রাসবিহারী বসু ব্যক্তিগতভাবে যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলেন যাতে এই বাহিনীকে আবার গড়ে তোলা যায়। ঠিক এই সন্ধিক্ষণে সুভাষবাবুর আবির্ভাব নাটকীয় হলেও বহু আকাঙ্ক্ষিত। তাই প্রথম বক্তৃতার পর থেকেই সুভাষবাবু অভাবনীয় জনপ্রিয়তা লাভ করলেন। এবং তাঁর আহ্বানে মাত্র ছ'মাসের মধ্যেই বিরাট এক যোদ্ধা-বাহিনী গড়ে উঠলো—আজীবন যে স্বপ্ন তাঁর যৌবনোজ্জ্বল দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ গ্রহণ করলো। রাসবিহারী বসু স্বেচ্ছায় অতি আনন্দের সঙ্গে আজাদ-হিন্দ-ফৌজের নেতৃত্বভার সুভাষচন্দ্রের হাতে তুলে দিলেন। সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করার পর সুভাষবাবু ২৫শে আগষ্ট যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তার পরিভাষা ঃ—

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন ও জাতীয় সেনা বাহিনীর হিতার্থে—আমি আজ থেকে সৈন্যবাহিনীর কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছি।

এটা আমার পক্ষে আনন্দ ও গর্বের বস্তু কারণ একজন ভারতীয়ের পক্ষে ভারতের মুক্তিসেনার অধিনায়কত্ব লাভ করার চেয়ে আর কোন বড সম্মান কিছু হতে পারে না। কিন্তু যে গুরু দায়িত্ব আমি গ্রহণ করেছি সে বিষয়ে আমি সচেতন আছি এবং আমি দায়িত্ব ভারে অবনত বলে বোধ করছি। প্রার্থনা করি সর্ব অবস্থায়ই ভারতবাসীর প্রতি আমার এই কর্তব্য বহন করার শক্তি ভগবান আমায় দান করুন, তা সে অবস্থা যতই কঠিন এবং ক্লেশদায়ক হোক না কেন।

বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী আমার আটত্রিশ কোটি দেশবাসীর সেবক হিসেবে আমি আমাকে মনে করি। আমি এমন ভাবে আমার কর্তব্য সম্পাদন করবার সঙ্কল্প করেছি যাতে এই আটত্রিশ কোটি নরনারী আমার হস্তে নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারে এবং প্রত্যেক ভারতবাসী আমার ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারে। কেবলমাত্র অনির্বাণ জাতীয়তাবোধ, এবং পূর্ণ ন্যায় ও নিরপেক্ষতার ওপর ভিত্তি করেই মুক্তিসেনা গঠন হতে পারে।

আমাদের দেশমাতার আসন্ন মুক্তি সংগ্রামের জন্য, আটত্রিশ কোটি ভারতবাসীর শুভ-ইচ্ছার ওপর প্রতিষ্ঠিত এক স্বাধীন শাসনতন্ত্র গঠনের জন্য, এবং চির দিনের তরে ভারতের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য এক চিরস্থায়ী সৈন্যবাহিনী সংগঠনার্থ এই জাতীয় সেনাবাহিনীকে আজ এক জীবন-মরণ সমস্যায় অংশ গ্রহণ করতে হবে। এই কর্তব্য সম্পাদনের নিমিত্ত আমরা আমাদের এমন এক বাহিনীতে রূপান্তরিত করবো যার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে ভারতের স্বাধীনতা এবং একমাত্র ইচ্ছা—'হয় করিব আর না হয় ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিব।' আমরা যখন দাঁড়াবো তখন জাতীয় সেনা বাহিনীকে প্রস্তরের প্রাচীরের মত মনে হবে; আর যখন অগ্রসর হব তখন মনে হবে গুরুভার পেষণ-চক্র।

আমাদের দায়িত্ব সহজ নয়। যুদ্ধ বহুদিন ব্যাপী ও ভীষণ হবে কিন্তু আমাদের ন্যায্য দাবী এবং দুর্ধর্ষতার ওপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে। আটত্রিশ কোটি মানুষ যারা সমস্ত মানবজাতির এক দশমাংশ, তাদের স্বাধীন হবার দাবী আছে এবং তারা আজ সেই স্বাধীনতার মূল্য দিতে প্রস্তুত! সুতরাং জগতের কোন শক্তিই আর আমাদের জন্মগত অধিকার থেকে আমাদের বঞ্চিত করে রাখতে পারবে না।

কার্যাধ্যক্ষ ও কর্মী বন্ধুগণ—! তোমাদের অসীম নিষ্ঠা ও অনমনীয় আনুগত্যের বলে এই জাতীয় সেনা বাহিনী ভারতের স্বাধীনতার যন্ত্র স্বরূপ হয়ে উঠবে। শেষ পর্যন্ত জয় আমাদের হবেই, আমি আশ্বাস দিচ্ছি। আমাদের কাজ ইতিমধ্যেই সুরু হয়ে গেছে।

যতদিন না দিল্লীর রাজ প্রতিনিধি ও প্রাসাদে আমরা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে পারি, যতদিন না ভারতের রাজধানীর প্রাচীন লালকেল্লায় জাতীয় সেনা বাহিনী বিজয় উৎসবের কুচকাওয়াজ করতে পারে ততদিন 'দিল্লী চলো' এই বাণী মুখে নিয়ে আমরা সংগ্রাম করে চলবো।

মূল শিবির	(স্বাক্ষর) সুভাষচন্দ্র বসু।
জাতীয়-সেনা-বাহিনী	সর্বাধিনায়ক,
২৫শে আগষ্ট ২৬০৩,	(সিপাহ্ শালার)

সমস্ত জগতের সম্মুখে এই বাণী ঘোষিত হয়ে গেল। সমস্ত জগৎ, বিশেষ করে ভারতবর্ষ তার সমস্ত প্রাণের উৎকণ্ঠা দিয়ে শুনলো এই অভিষেকের সংবাদ। সিঙ্গাপুর, জোহর, পেনাং ইপো, সেরেম্বান, জিত্রা, ব্যাংকক এবং রেঙ্গুনে সামরিক শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হল। প্রত্যেক শিক্ষা কেন্দ্রে গড়ে ৩৫০০ সৈন্যের আধুনিকতম যুদ্ধ বিদ্যায় শিক্ষিত করার ব্যবস্থা হল। দলে দলে ভারতীয় যুবক—সর্ব জাতের,

সর্ব ধর্মের—এসে যোগ দিতে লাগল এই সব শিক্ষা কেন্দ্রে। শুধু যে যুবকরাই এসে যোগ দিলে তা নয় সিঙ্গাপুরে নারী বাহিনীর শিক্ষা কেন্দ্রে নারীরাও এসে যোগ দিতে লাগল দলে দলে। এদের নিয়েই ঝাঁসীর রাণীর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে ঝাঁসী রাণী বাহিনী সংগঠিত হল। সোভিয়েট রাশিয়ায় দেশের স্বাধীনতার জন্য নারীরাও সম্মুখ সমরে নেমে এসে অস্ত্র চালনা করেছিল—তার জন্য বৃটিশ আর আমেরিকানরা তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল, বার বার ভারতবর্ষের সামনে তুলে ধরেছিল সেই ছবি ভারতের কমিউনিষ্ট 'বন্ধুরা'—তাদেরই চোখের সামনে বিস্ময় ও আনন্দের কোলাহলের মধ্যে ঘোষিত হল যে ভারতের নারী যাদের অসহায় দুর্বল বলে বদনাম আছে তারা দলে দলে আজ তৈরী হচ্ছে তাদের এই মিথ্যা অপবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে—মুখের ভাষায় নয় কামানের গর্জন দিয়ে। এই নারী বাহিনী মালয়ের মহিলা চিকিৎসক কুমারী লক্ষ্মী স্বামীনাথনের অধীনে শিক্ষিত হতে থাকলো। আর যুবকদের বাহিনী মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহরু, মৌলানা আজাদ ও সুভাষবাবুর নামে বিভক্ত করা হল। সুভাষবাবুর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে আজাদ হিন্দ দল গড়ে উঠলো। তাদের সামরিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দখলের পর স্বাধীন ভারত ভূমিতে শাসন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য শাসনব্যবস্থা শিক্ষা দেওয়া হতে লাগলো। তাছাড়া সামরিক অধিনায়কদেরও একটা শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হল।

এইবার এই সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার আবেদন পত্রের একটা প্রতিলিপি দেওয়া হচ্ছে। এই সব প্রতিলিপি আজাদ-হিন্দ ফৌজের বিচারের সময় প্রদর্শিত হয়েছিল।

আজাদ হিন্দ ফৌজের বেসামরিক স্বেচ্ছাসেবকের

অন্তর্ভুক্ত হবার অবেদন পত্র।

প্রথমেই সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে যে অন্তর্ভুক্ত হবার পর যদি জানা যায় যে আপনি এ সমস্ত প্রশ্নের ভুল উত্তর দিয়েছেন তাহলে আপনাকে ভারতীয়

স্বাধীনতা সঙ্ঘের হুকুমনামা অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করতে হবে।

১। নাম ঃ (ছাপা অক্ষরে)

২। ঠিকানা ঃ

(ক) ভারতবর্ষে	(খ) পূর্ব এশিয়ায়
গ্রাম ঃ	পোষ্ট অফিস ঃ
পোষ্ট অফিস ঃ	সহর বা নগর ঃ
থানা ঃ	জেলা ঃ
তহসিল ঃ	কানপং বা এষ্টেট ঃ
জেলা ঃ	দেশ ঃ
প্রদেশ ঃ	

৩। বয়স ঃ

৪। যোগ্যতা ঃ

(ক) শিক্ষা ঃ

(খ) ভাষা ঃ

(গ) কারিগরী ঃ

৫। বিবাহিত অথবা অবিবাহিত।

বিবাহিত হলে বর্তমানে পরিবার কোথায় ? কয়জন সন্তান জীবিত ?

৬। কখনও কারাবাসে পতিত হয়েছেন কিনা (কেন ?)

৭। বর্তমানে কি কাজ করা হয় ?

৮। কখনও সমর বিভাগে যোগ দিয়েছেন কিনা ? দিয়ে থাকলে কতদিন কোন পদে ?

৯। আই, আই, এল আপনাকে যেখানেই পাঠাবে সেখানে যেতে এবং কাজ করতে ইচ্ছুক কি না তা সে জাতীয় সেনা বাহিনীতেই হোক কিংবা অন্য কোথাও হোক ঃ

শ্রীযুত রাসবিহারী বসু

লেঃ কর্ণেল গীল

আমি……………নিশ্চিতভাবে ঘোষণা করছি যে আমার উক্ত প্রশ্নের উত্তর সমুহ যথার্থ এবং আমি সংযুক্ত অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করতে স্বেচ্ছায় রাজী আছি।

কার্যাধ্যক্ষের অনুমোদন পত্র

আমি অনুমোদন করছি যে উপরের প্রশ্নগুলির উত্তর আমার সামনে দেওয়া হয়েছে এবং আমি লিখে নিয়েছি (অথবা আমার সামনে লেখা হয়েছে)।

তারিখ……………২৬……………

স্বাক্ষর……… ………

অন্তর্ভুক্ত হবার বর্ণনা (নিয়মাবলী নীচে দেখুন)

আর, ও (অথবা স্থানীয় চেয়ারম্যান বা লীগের সেক্রেটারী) দ্বারা পূরণ করা হবে।

বয়স………বছর। বুকের মাপ……………সর্বোচ্চ………ইঞ্চি

উচ্চতা……… সর্বনিম্ন………ইঞ্চি

ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক দ্বারা পূরণ করা হবে।

আমি……………কে সেনাবাহিনীর জন্য উপযুক্ত মনে করি, (এখানে উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত লিখুন)। স্মারক চিহ্ন।

স্থান :………

তারিখ :………

ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক।

দ্রষ্টব্য—(ক) সাধারণ স্বাস্থ্য সাধারণের চেয়ে ভাল হওয়া দরকার এবং সামরিক কার্যে—বিঘ্ন ঘটাবার মত কোনরকম অক্ষমতা থাকা উচিৎ নয়।

(খ) যে ব্যক্তির পরিবারের কোন দায়িত্ব নাই তিনি আগে স্থান পাবেন।

(গ) যে ব্যক্তি অন্ততঃ নিজের মাতৃভাষায় লিখতে বা পড়তে পারেন তিনি আগে স্থান পাবেন।

অঙ্গীকার পত্র

১। আমি এখানে আমার নিজস্ব স্বাধীন ইচ্ছায় ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের বেসামরিক স্বেচ্ছাসেবক দলে আমার নাম দিতে যাচ্ছি।

২। আমি অকপটভাবে এবং বৈধভাবে ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে আমার জীবন উৎসর্গ করছি এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য আমার জীবন পণ করছি। আমার জীবন বিপন্ন করেও আমি ভারতবর্ষেব এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সেবা করে যাবো।

৩। দেশের সেবায় আমি আমার নিজেব স্বার্থের দিকে চাইবো না।

৪। প্রদেশ, ভাষা ও ধর্মের বিভিন্নতা না দেখে আমি সমস্ত ভারতবাসীকে আমার ভাই বোন মনে করবো।

৫। আমি দ্বিধা না করে বিশ্বস্তভাবে স্বাধীনতা সঙ্ঘের সমস্ত আদেশ ও নির্দেশ পালন করবো আমি আমার উপরকার যে সব কার্যাধ্যক্ষদের অধীনে প্রায়ই কাজ করতে আদিষ্ট হব তাঁদের সমস্ত ন্যায্য ও বৈধ আদেশ পালন করে যাবো।

তারিখ·········২৬·········

স্থান······ ·· (স্বাক্ষর)···········

সর্বশুদ্ধ অধিনায়কদের সংখ্যা হল ১৫০০ এবং সাধারণ সৈনিকদের সংখ্যা হল ৫০,০০০। এবং স্বাধীন ভারত সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যদের সংখ্যা হল ২১। এই সদস্যদের নাম ও কার্যভার নিম্নে দেওয়া হল—

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু—রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক, প্রধান মন্ত্রী, পররাষ্ট্র সচিব

ও সমর নায়ক। মিঃ এস, এ, নায়ার—প্রচার বিভাগ; ক্যাপ্টেন মিস্ লক্ষ্মী স্বামীনাথন্—নারী বিভাগ; লেফ্‌ট্ন্যাণ্ট কর্ণেল এ, সি, চ্যাটার্জী—রাজস্ব বিভাগ; লেঃ কঃ গুলজারা সিং, লেঃ কঃ এম, জেড্ কিয়ানি, লেঃ কঃ এ, পি, লোকনাথন্, লেঃ কঃ এশান কাদীর, লেঃ কঃ শাহ্ নওয়াজ—সমর বাহিনীব প্রতিনিধিবৃন্দ; মিঃ এ, এম, সহায়—সম্পাদক; শ্রীযুত রাসবিহারী বসু—প্রধান পরামর্শদাতা; করিম গনি, দেবনাথ দাস, ডি, এম, খান, এ, ইযেল্লাপ্পা, জে থিভী, এবং সর্দার ঈশার সিং—পরামর্শদাতা; মিঃ এ, এল, সরকার—আইন বিভাগ। লেঃ কঃ আজীজ আহ্‌মেদ, লেঃ কঃ এন, এস, ভগৎ, কঃ জে, কে, ভোঁসলে।

এত বড় বাহিনীকে পরিচালনা করা কম অর্থসাপেক্ষ নয়। সাধারণতঃ মনে হয় যে এই বিশাল অর্থ নিশ্চয়ই জাপানীর কাছ থেকেই সুভাষবাবু গ্রহণ করেছিলেন। আসল তথ্য জানতে পারার আগে পর্যন্ত বৃটেন থেকে সেই রকম প্রচারই করা হয়েছিল। আমাদের দেশের তথাকথিত কমিউনিষ্টরা এবং অনেক ভণ্ড দেশপ্রেমিকও এই প্রচার কার্যে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু আসল তথ্য উদ্ঘাটনের পর সমস্ত বিশ্বের অধিবাসী স্তম্ভিত হয়ে শুনলে যে এই সমস্ত অর্থ স্থানীয় ভারতীয়েরা নিজেরাই চাঁদা করে সংগ্রহ করেছিল। একমাত্র ব্রহ্ম দেশেই কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সুভাষবাবু ৮ কোটি টাকা সংগ্রহ করেন। হয়ত জাপানীদের কাছে হাত পাতলে প্রচুর টাকা তিনি জোগাড় করতে পারতেন এবং তার ফলে অর্থাভাবের দরুণ তাঁদের যে অমানুষিক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে—এমন কি অর্থাভাবই পরাজয়ের মস্ত বড় একটা কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে—সে সব এড়িয়ে যেতে পারতেন কিন্তু তবু আত্মসম্মান বিক্রি করে—নিজের দেশের মর্যাদার বিনিময়ে তিনি অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন নি। এর পরেও কি কেউ তাঁকে জাপানী দালাল বা জাপানীর হাতের পুতুল বলতে সাহস করবে? পরবর্তীকালে সেনাদের কাছে জানা গেছে যে সর্বশুদ্ধ তাদের ৩৫ কোটি টাকা

উঠেছিল। সুভাষবাবুর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে সমস্ত লোকে মুক্ত হস্তে এই অর্থভাণ্ডারে সাহায্য করতো। অনেকে এই জন্যে সর্বস্বান্ত পর্যন্ত হয়েছেন। সুভাষবাবু যখনই বক্তৃতা দিতেন তখন ২০ থেকে ২৫ হাজার নরনারী এসে সমবেত হত এবং রোদ জল ঝড় উপেক্ষা করে ক্রমান্বয়ে চার পাঁচ ঘণ্টা ধরে তারা এই বক্তৃতা মন্ত্রমুগ্ধের মত শ্রবণ করতো। এই সব বক্তৃতাসভায় প্রচুর টাকা সংগৃহীত হত। প্রত্যেক সভাতেই সুভাষবাবুকে মাল্যে ভূষিত করা হত এবং সভাশেষে এই মালা নিয়ে নীলাম করা হত। প্রথম বক্তৃতা শেষে এই মালা নীলাম করে ওঠে এক লাখ টাকা, দ্বিতীয় বক্তৃতায় দু'লাখ, তৃতীয় বক্তৃতায় ৩ লাখ এবং চতুর্থ বক্তৃতায় ১২ লাখ টাকা। ১২ লক্ষ টাকা! অবিশ্বাসী মন বিশ্বাস করবে কি? শোনা যায় এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক তাঁর সমস্ত সম্পত্তির বিনিময়ে একবার একটি মালা ক্রয় করেছিলেন।

২১শে অক্টোবর ১৯৪৩। এই দিন পূর্ব এশিয়ার—শুধু পূর্ব এশিয়ার কেন সমগ্র ভারতবাসীর পক্ষে এক স্মরণীয় দিন। এই দিন সিঙ্গাপুরে মিউনিসিপ্যাল ময়দানে ভোর হতেই এক অভাবনীয় দৃশ্যের অবতারণা। সেদিন সমস্ত মুক্তি সেনা সব জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এসে মিলিত হয়েছে এই প্রাঙ্গণে। সামরিক কায়দায় দাঁড়িয়েছে গান্ধী বাহিনী, নেহরু বাহিনী, আজাদ বাহিনী, সুভাষ বাহিনী আর তাদেরই সাথে হাতে হাত মিলিয়ে দাঁড়িয়েছে ঝাঁসী বাহিনীর নারী সেনার দল। এই সৈন্য বাহিনী ছাড়া বহু জাপানী জার্মানী ও ইটালিয়ান অফিসারও এসে মিলিত হয়েছেন। সব জড়িয়ে লক্ষাধিক নরনারীর এক বিচিত্র সমাবেশ। আর সবার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছেন বঙ্গবীর সুভাষচন্দ্র বসু। মাথার ওপর সুউচ্চ দণ্ডে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা উড়ছে। এই সম্মিলনে, এই ত্রিবর্ণ পতাকার নীচে, এই নেতার এক নায়কত্বে আজাদ-হিন্দ-ফৌজের ব্রত সুরু হল।

আজ থেকে সবার সাথে সুর মিলিয়ে দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রকে আমরা

নেতাজী বলে ডাকবো। আজ থেকে প্রত্যেক ভারতীয়কে এক মাত্র শব্দে অভিবাদন জানাবো—একটি মাত্র শব্দে ঘুমন্ত ভারত সোণার কাঠির স্পর্শ পেয়ে জাগ্রত হয়ে উঠবে—একটি মাত্র শব্দ চোখের সামনে ভাস্বর করে দেবে দিল্লী চলার পথ ·সবার সঙ্গে স্বর মিলিয়ে সেই মন্ত্র আমরা উচ্চারণ করবো—'জয় হিন্দ'। একদিন বাঙ্গলার সাধক বঙ্কিমচন্দ্র মহামন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন—বন্দে মাতরম্—সেই মন্ত্রে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল সমস্ত ভারতের নিদ্রিত জনতরঙ্গ। তারপর বহু দুর্যোগ গেছে, বহু নির্যাতন, বহু উত্থান পতন, তারপর আবার এই মন্ত্র উচ্চারিত হল সেই মহামন্ত্রেরই আর এক অখণ্ড প্রকাশ—ইষ্টদেবী দেশমাতৃকার বীজ মন্ত্র—'জয় হিন্দ'।

হে হত চেতন ভারতবাসী মনে রেখো ২১শে অক্টোবর তোমার কি দিন! যুগে যুগে তুমি স্মরণ করো এই দিন এক দল বিপ্লবী ভারতসন্তান স্বাধীন ভারতের পূর্ব-দিগন্তে দাঁড়িয়ে পশ্চিম দেশের বর্বর সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের বিরুদ্ধে—বৃটিশের মিত্র আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। অসহযোগ আন্দোলন নয়, বিক্ষুব্ধ মনের ব্যর্থ আস্ফালন নয়, বক্তৃতার ফাঁকা বুলি নয়, কমিউনিজমের বিশ্বজনীনতার ভণ্ডামীও নয়—রীতিমত যুদ্ধের আহ্বান, কামানের বিরুদ্ধে কামানের প্রতিধ্বনি! অসির বিরুদ্ধে অসির ইস্পাত!—রক্তের বদলে রক্ত!

নেতাজী সবার মাঝে দাঁড়িয়ে অভিবাদন গ্রহণ করলেন। এ অভিবাদন যুক্তকরের বিনীত প্রণাম নয়, এ অভিবাদন গগন প্রকম্পিত জয়ধ্বনি নয়—এ অভিবাদন তারা জানালো হাজার হাজার উন্নত বেয়নেটের জৌলুস দিয়ে। আনন্দে, গর্বে, উত্তেজনায় হতবাক হয়ে গেলেন নেতাজী। পনেরো মিনিট ধরে নিস্পন্দ হয়ে চেয়ে রইলেন সেই জাগ্রত জনতার দিকে। নিস্পন্দ হয়ে রইলো সেই লক্ষাধিক মানুষ নেতাজীর পানে চেয়ে। যারা অস্ত্র তুলে ছিল তারা নামাতে পর্যন্ত ভুলে গেল। সকলের দৃষ্টিতে সে এক অভিনব আশার আলো। সেই আলোতে ফুটে উঠছে দিল্লী যাওয়ার সুদীর্ঘ কণ্টকময় পথ,—সে পথে নতুন

সূর্যের লাল আলো এসে পড়েছে। তাদের কানে ভেসে আসছে মৃত জালিয়ানওয়ালা বাগের রক্ত-স্রোতের নির্মম কল্লোল—নিশ্বাসে নিশ্বাসে বহু নির্বাপিত জীবন-বহ্নির ধূমায়িত বাতাস।......

ছিদ্রহীন অন্ধকারের মত কঠিন নিঃশব্দ!

পনেরো মিনিট পর নেতাজীর চমক ভাঙ্গলো। তিনি অস্ত্র নামাতে আদেশ দিলেন। তারপর প্রভাতের সিংহদ্বার থেকে সূর্যের আশীর্বাদের মত তাঁর বাণী শোনা গেল: আপাততঃ আমি তোমাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যন্ত্রণা, সুদীর্ঘ পথ এবং মৃত্যু ছাড়া কিছুই দিতে পারবো না। দিল্লীর লাল কেল্লায় জাতীয় পতাকা তোলবার আগে পর্যন্ত তোমার সমস্ত কিছু তোমাকে ত্যাগ করতে হবে। এই পথ সুদীর্ঘ এবং কণ্টকময়। আমি তোমাদের কাউকেই আমার সঙ্গে যোগ দিতে জোর করছি না। কিন্তু দেশপ্রেমিক ভারতবাসী মাত্রই তার কর্তব্যের কথা জানে। যাদের সাহস নেই যারা এই নিদারুণ দুঃখ ক্লেশ সহ্য করতে পারবে না তারা এই সেনা-বাহিনী ছেড়ে চলে যেতে পারে এবং আমি কথা দিচ্ছি তাদের কোনরকম নিন্দা করা হবে না। কারণ আমি এমন একদল পরীক্ষিত পুরুষ এবং নারী চাই যারা ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে।

অন্ধকারে এবং রৌদ্রালোকে, দুঃখে এবং সুখে, চরমতম দুর্দশায় এবং বিজয়ের আনন্দে আমি তোমাদের সঙ্গেই থাকব একথা তোমরা বিশ্বাস করো।......

তোমাদের সঙ্গে আমি আবার ভারতবর্ষে দেখা করবো। যে কোন স্থানে যে কোন অবস্থায় থাকো না কেন, সর্বদা মনে রাখবে যে তুমি আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সৈনিক। ভারতের স্বাধীনতাই তোমার একমাত্র ধর্ম; রক্ত চাই—রক্ত, আরও রক্ত। জয় হিন্দ্......

দূরে বহুদূরে ঐ নদী ছাড়িয়ে ঐ জঙ্গলাকীর্ণ ভূখণ্ড ছাড়িয়ে, ঐ পাহাড় পর্বত ছাড়িয়ে আমাদের দেশ—ঐ দেশে আমরা জন্মেছি, ঐ দেশে আবার আমরা ফিরে যাচ্ছি। স্বদেশ আমাদের আহ্বান করছে, রাজধানী দিল্লী আমাদের

ডাকছে—আটত্রিশ কোটি আশীলক্ষ দেশবাসী আমাদের ডাকছে—আত্মীয়েরা ডাকছে আত্মীয়দের ; ওঠ, নষ্ট করবার মত সময় আমাদের নাই, অস্ত্র হাতে লও ! সম্মুখে আমাদের বিস্তীর্ণ পথ—ঐ পথ তৈরী করে গেছেন আমাদের পথ-প্রদর্শকগণ ! সে পথ ধরেই আমরা এগিয়ে যাবো, পথ করে নেবো শত্রু-সেনার মধ্য দিয়ে। ভগবান যদি চান আমরা শহীদের ন্যায় মৃত্যুবরণ করবো ; যে পথ দিয়ে আমাদের সেনাবাহিনী দিল্লী পৌছুবে, মৃত্যুর পূর্বে আমরা একবার সে পথ চুম্বন করে নেবো। দিল্লীর পথ স্বাধীনতার পথ—চলো দিল্লী। জয় হিন্দ্।

আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট স্থাপন হবার সঙ্গে সঙ্গে জাপান, জার্মাণী, ইটালী, স্পেন, শ্যাম, আয়র্ল্যাণ্ড প্রভৃতি সমস্ত স্বাধীন রাজ্য এই গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করে নিয়েছিল। নেতাজী জাপানে, জার্মাণীতে—সর্বত্রই স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিনায়ক হিসাবেই সম্মানিত হয়েছিলেন। পরাধীন ভারতবর্ষের পক্ষে এ এক অভাবনীয় গৌরবের বস্তু। স্বাধীন রাষ্ট্রের মত আজাদ হিন্দেরও বেতার কেন্দ্র ছিল। এবং আজ আর স্বীকার করতে বাধা নেই যে সেই সময় দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, ভারতের ঘরে ঘরে ভারতবাসীরা কান পেতে তাঁদের হৃদয়ের সমস্ত আগ্রহ দিয়ে সেই বেতারকেন্দ্রের খবর এবং নেতাজী ও অন্যান্য সমর নায়কদের বাণী শ্রবণ করতো এবং আশার ও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠতো। যে স্বাধীনতার স্বাদ তারা পায় নি, তাদেরই দেশের ভাইবোনেরা অন্যত্র সে স্বাদ ভোগ করছে এবং সেই স্বাদের অংশ সমস্ত ভারতকে দেবার জন্য প্রাণপণ করে সংগ্রাম চালাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে সুদূরের সেই সংবাদ পেয়ে ভারতের শৃঙ্খলিত নর-নারীর দল মনের মধ্যে অদ্ভুত এক উত্তেজনা বোধ করতো। সে সব দিন আজ স্বপ্নের মত জল জল করে।

আই, এন, এ বিচারের সময়ে এবং পূর্বে আমাদের আলোচনার মধ্যে আমরা দেখেছি যে যতই এই গভর্ণমেণ্টকে জাপানের দাস বলা হোক না কেন, আসলে

আজাদ হিন্দ সরকার সম্পূর্ণ স্বাধীন এক শাসনতন্ত্র। এবং এই স্বাধীন ভারতের প্রকৃত রূপ জানতে হলে আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের প্রথম ঘোষণাপত্র সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা দরকার। এই ঘোষণা পত্রের বাঙ্গলা পরিভাষা নীচে দেওয়া গেল :

১৭৫৭ সালে বাঙ্গলায় বৃটিশের হাতে প্রথম পরাজয়ের পর ভারতের অধিবাসীরা একশ' বছর ধরে ক্রমান্বয়ে একের পর এক কঠিন নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। এই সময়ের ইতিহাস বহু বীরত্ব ও আত্মত্যাগে পরিপূর্ণ। ইতিহাসের পাতায় অনেকেব মধ্যে বাঙ্গলার সিরাজদ্দৌলা ও মোহনলাল, দক্ষিণ ভারতের টিপু সুলতান ও ভেলু তম্পী, মহারাষ্ট্রের আপ্পা সাহেব ভোঁসলে ও পেশোয়া বাজীরাও, অযোধ্যার বেগমগণ, পাঞ্জাবের সর্দার শ্যাম সিং আতারিওয়ালা এবং শেষতঃ ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মী বাঈ, তান্তিয়া তোপী, ডুমরাঁওয়ের মহারাজ কুনওয়ার সিং এবং নানা সাহেবের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের পূর্বপুরুষেরা বুঝতে পারে নি সমগ্র ভারতেব পক্ষে বৃটিশ কি ভয়াবহ সঙ্গীন অবস্থার সৃষ্টি করছিল এবং সেইজন্য তারা ঐক্যবদ্ধ ভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে নি। অবশেষে যখন তারা অবস্থার প্রকৃত তাৎপয বুঝতে পারলো তখন ভারতের অধিবাসীরা একতাবদ্ধ হয়ে ১৮৫৭ সালে বাহাদুর শাহের অধীনে স্বাধীন মানুষের মত শেষ যুদ্ধ করে। যুদ্ধের প্রথম দিকে কয়েকটা গৌরবময় জয়লাভের পরও দুর্ভাগ্যবশতঃ এবং ভুল পরিচালনার ফলে শেষ পযন্ত বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং বশ্যতা স্বীকার করে। যাই হোক আমাদের আরও ত্যাগ ও বীরত্বের দিকে অনুপ্রাণিত করবার জন্যে ঝাঁসীর রাণী, তান্তিয়া তোপী, কুনওয়ার সিং এবং নানা সাহেব সমগ্র জাতির হৃদয় আকাশে তারকার মত উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

১৮৫৭ সালের পর বলপূর্বক নিরস্ত্র হওয়ার পর এবং বহু অত্যাচার ও নৃশংসতায় জর্জরিত হয়ে ভারতবাসী কিছু দিনের জন্য মাথা নত করে পড়েছিল—কিন্তু

১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আবার এক নতুন জাগরণ সুরু হয়ে গেল। ১৮৮৫ সাল থেকে গত মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ভারতবাসী নানাবিধ উপায়ে তাদের হৃত স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে, যথা—আন্দোলন ও প্রচার, বৃটিশ পণ্য বর্জন, সন্ত্রাসবাদ ও উৎপাত—এবং শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র বিপ্লব। কিন্তু এই সমস্ত চেষ্টাই কিছুদিনের জন্য ব্যর্থ হয়ে যায়। পরিশেষে ভারত ব্যর্থ মন নিয়ে যখন নতুন পথের সন্ধান খুঁজে বেড়াচ্ছিল সেই সময়ে ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের নতুন অস্ত্র নিয়ে দেখা দিলেন।

সেই থেকে বিশ বছর ভারতবাসী এক তীব্র দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে। স্বাধীনতার বাণী ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে পৌঁছেছিল। ব্যক্তিগত আদর্শের মধ্য দিয়ে জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য ত্যাগ করতে এবং প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে শিখলো, কেন্দ্র থেকে প্রতি সীমানা পর্যন্ত বিশাল জনতা একটিমাত্র রাজনৈতিক দলে ঐক্যবদ্ধ হল। এইরূপে ভারত যে তার হারিয়ে যাওয়া রাজনৈতিক চেতনাকে শুধু ফিরে পেল তা নয়, সে একটি রাজনৈতিক এককে পরিণত হল। তারা এখন এক সুরে একই লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে একমুখী ইচ্ছায় দাবী জানাতে পারে! ১৯৩৭ থেকে ৩৯ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস মন্ত্রিদের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে তারা দেখিয়ে দিলে তাদের নিজেদের শাসন ব্যবস্থা চালাবার ক্ষমতা তারা রাখে এবং তার জন্য প্রস্তুত।

এইরূপে বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায় সুরু হয়ে গেছে। এরই মধ্যে জার্মানী তার মিত্রশক্তির সাহায্যে আমাদের শত্রুকে ইউরোপে আঘাতে কাঁপিয়ে তুলেছে—আর জাপান তার মিত্রশক্তির সাহায্যে পূর্ব-এশিয়ায় আমাদের শত্রুকে চরম আঘাত হেনেছে। এই অবস্থার সুন্দর যোগাযোগের মধ্যে ভারতবর্ষ তার জাতীয় পুনরুজ্জীবনের স্বর্ণ সুযোগ পেয়েছে।

বর্তমান ইতিহাসে এই প্রথম প্রবাসী ভারতীয়রাও রাজনীতিতে চেতনালাভ করেছে এক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। তারা যে শুধু দেশের লোকদের

সঙ্গে একযোগে চিন্তা করতে শিখেছে তা নয় তারা তালে তালে পা ফেলে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে চলেছে। বিশেষ করে পূর্ব এশিয়ায় প্রায় কুড়ি লক্ষ ভারতীয় পূর্ণ সমর সজ্জার আহ্বানে অনুপ্রাণিত হয়ে এক ঘন সন্নিবিষ্ট ব্যূহে পরিণত হয়েছে। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে ভারতীয় সেনা বাহিনীর পর্যায়ভূক্ত সেনার দল —মুখে তাদের এক বাণী— দিল্লী চলো।

বৃটিশের ধাপ্পাবাজীতে, ইচ্ছাকৃত লুণ্ঠন ও দুর্ভিক্ষের মহামারীতে ভারতবাসীরা মরীয়া হয়ে উঠেছে এবং বৃটিশজাতি ভারতের সমস্ত শুভেচ্ছা হারিয়ে এখন ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় অবস্থান করছে। এই অশান্তি ও অরাজকতাকে উচ্ছেদ করতে মাত্র একটি স্ফুলিঙ্গের প্রয়োজন। ভারতীয় মুক্তি সেনার কর্তব্য সেই স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে দেওয়া। দেশের বেসামরিক জনসাধারণের এবং বৃটিশের ভারতীয় সেনা বাহিনীর এক বিরাট অংশের উৎসাহে আশান্বিত হয়ে এবং বিদেশের অজেয় বীর মিত্রশক্তির সাহচর্যে—কিন্তু সবার উপর আত্মশক্তির ওপর বিশ্বাস রেখে ভারতীয় মুক্তি সেনা এই ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদনে আস্থাবান।

বর্তমানে স্বাধীনতার প্রথম প্রভাত যখন অতি নিকটে তখন ভারতবাসীর উচিৎ একটা সাময়িক স্বাধীন শাসনতন্ত্র গঠন করে তারই পতাকাতলে স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম সুরু করে দেওয়া। কিন্তু সমস্ত নেতারা যখন কারারুদ্ধ, দেশবাসী যখন সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, তখন দেশের মধ্যে এই স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা কিংবা তারই অধীনে সশস্ত্র সংগ্রাম চালানো সম্ভব নয়। সুতরাং দেশে এবং বিদেশে সমস্ত ভারতবাসীর দ্বারা উৎসাহিত পূর্ব এশিয়ার এই ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের কর্তব্য হল একটি স্বাধীন ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করা এবং এই সঙ্ঘ পরিচালিত ভারতীয় মুক্তি সেনার (অর্থাৎ আজাদ হিন্দ ফৌজ বা Indian National Army) সাহায্যে স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম সুরু করে দেওয়া।

পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতা সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত সাময়িক স্বাধীন ভারতের গভর্ণমেণ্ট হিসেবে গঠিত হয়ে, আমাদের ওপর ন্যস্ত সমস্ত গুরু দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়েই

আমরা আমাদের আরব্ধ কর্ম স্থরু করছি। প্রার্থনা করি ভগবান আমাদের এই কার্যে ও মাতৃভূমির মুক্তি সংগ্রামে আশীর্বাদ করুন। এবং এখানে আমাদের দেশ মাতার মুক্তির জন্য, মঙ্গলেব জন্য এবং জগৎ সভায় উচ্চাসন লাভের জন্য আমবা আমাদের এবং আমাদেব সহকারীদের জীবন পণ করছি।

এই সামযিক সরকারের কাজ হবে বৃটিশ এবং তার মিত্র জাতি সমূহকে ভারত ভূমি থেকে বহিষ্কৃত করে দেওয়ার জন্য সংগ্রাম পরিচালনা করা। তার পরের কর্তব্য হবে দেশের জনসাধারণের ইচ্ছামত এবং তাদের বিশ্বাসের ওপর এক স্থায়ী স্বাধীন জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা করা। বৃটিশকে পরাজিত ও বহিষ্কৃত করার পর জাতীয় সরকার স্থাপন না হওয়া পর্যন্ত এই সাময়িক সরকার ভারতীয় অধিবাসীদেব বিশ্বাস বজায় রেখে শাসনের কার্যভার বহন করে যাবে।

সাময়িক সরকারের প্রত্যেক ভারতবাসীর সমর্থন পাবার অধিকার আছে এবং সে দাবী জানানো হচ্ছে। এই সরকার ধর্মের স্বাধীনতা স্বীকার করে এবং প্রত্যেক অধিবাসীব সমান অধিকারের সমর্থন করে। অতীতের বিদেশী শাসনের কৌশল-সঞ্জাত সমস্ত বিভেদবুদ্ধি অতিক্রম করে এবং দেশের সব সন্তানকে সমচক্ষে দেখে এই সরকার দলগত ও অংশগতভাবে সমস্ত জাতির কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য পণ করেছে।

ভগবানের নামে, অতীত যুগে যাঁরা ভারতীয় জনগণকে সুসংবদ্ধ করেছিলেন তাঁদের নামে এবং যে সকল পরলোকগত বীর আমাদের নিকট বীরত্ব ও আত্ম-ত্যাগের আদর্শ স্থাপন করে গেছেন তাঁদের নামে আমরা ভাবতীয় জনসাধারণকে আমাদেব পতাকাতলে সমবেত হবার জন্য আহ্বান করছি। বৃটিশের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামের আয়োজন করার জন্য আমরা তাঁদের এবং তাঁদের মিত্রদের আহ্বান করছি। শত্রু যতদিন না ভারতভূমি থেকে বহিষ্কৃত হয় ততদিন পর্যন্ত এই সংগ্রাম সাহস, অধ্যবসায় ও চরম জয়ের ওপর আস্থা রেখে চালিয়ে যেতে হবে।

এই ঘোষণা পত্রের শেষে স্বাক্ষর করেছিলেন; নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু ক্যাপ্টেন মিস্ লক্ষ্মীবাঈ, এস, এ, নায়ার, লেঃ, কঃ, এ, সি, চ্যাটার্জী, লেঃ, কঃ

আজীজ আহ্মেদ, লেঃ, কঃ, এন, এস, ভগৎ, কঃ, জে, সিং, লেঃ, কঃ, এম জেড্ কিয়ানী, লেঃ, কঃ, এ, ডি, রঙ্গনাদন, লেঃ, কঃ, শাহ্ নওয়াজ, এ, এম, সহায়, রাসবিহারী বসু, করিম গণি, দেবনাথ দাস, ডি, এম, খান, এ, ইয়ালাপ্পা, জে, থিভী ও সর্দার ইশার দিন।

সেনাবাহিনী গঠনের সঙ্গে সঙ্গে এবং শাসনতন্ত্র গঠনের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি জাতীয় সঙ্গীতও রচনা করা হয়। বলা বাহুল্য এই সব সঙ্গীত আজাদী ফৌজের রাষ্ট্রভাষা হিন্দী ভাষাতেই রচিত হয়েছিল। দুটি গান এখানে উল্লেখ করা গেল—

কদম্ কদম্ বাড়ায়ে যা
খুসীকে গীত গায়ে যা
এ জিন্দগী হ্যায় কৌম্ কী
তে কৌম্ পে লুটায়ে যা
তু শেরে হিন্দ্ আগে বাড
মরণ সে ফিরভি তু ন ডর
আসমান তক্ উঠাকে শির
জোশে বতন্ বাড়ায়ে যা॥

তেরে হিম্মৎ বাড়তি রহে
খুদা তেরী শুনতা রহে
যো সামনে তেরে চড়ে
তো খাক্‌মে মিলায়ে যা॥

চলো দিল্লী পুকারকে
কৌমী নিশান সামাল কে
লাল কিল্লে পৈ গাড় কে
লহ্‌রায়ে যা লহ্‌রায়ে যা॥

আর একটি সমর সঙ্গীত—

অব দিল্লী চল, দিল্লী চল
দিল্লী চলেংগে
রোকেন হম কিসি কে রুকেঁ হৈঁ
ন রুকেংগে।
ঝণ্ডা তিরংগা লাল কিলে
পৈ উড়ায়েংগে
জয় হিন্দকে নারোঁ সে ফলক
কো হিলায়েংগে।
হিন্দোস্তাঁ মে হিন্দী হী
অব রাজ করেংগে
অব দিল্লী চল দিল্লী চল
দিল্লী চলেংগে।
আগে হী বঢ়েংগে ন কিসী সে
ভী ডরেংগে
হম মৌত কা ভী সামনে হঁস হঁস
কে করেংগে।

এই গান ছাড়া বন্দেমাতরম্ গান এবং জনগণ মন অধিনায়ক···এই গানের হিন্দী অনুবাদেরও খুব প্রচলন হয়েছিল। বেতার কেন্দ্রের প্রত্যেক অনুষ্ঠানের আগে বন্দেমাতরম্ গানের রেকর্ড বাজানো হত। এই রেকর্ড বাঙ্গালী গায়ক ভবানী দাসের। আর একখানি সুমধুর গান সৈন্যদের মুখে মুখে ফিরতো সেটির প্রথম কলি হল 'দিল্লী দিল্লী যায়েঙ্গে'···। আজকের দিনে এই সব সঙ্গীত আবার নতুন করে আমাদের উদ্দীপনার সৃষ্টি করবে, আমাদের রক্তকে উচ্ছল করে তুলবে। বিশেষ করে 'কদম্ কদম্ বাড়ায়ে যা' গানটি ইতিমধ্যেই অন্যতম প্রধান জাতীয় সঙ্গীত হয়ে উঠেছে। বন্দেমাতরমের মত এ গানটিও প্রত্যেক ভারতবাসীর অভ্যাস করা উচিত।

জাতীয় সঙ্গীত, দৈনিক প্রচারপত্র, বেতাব সহযোগে প্রচার, সংবাদপত্র মারফৎ প্রচার এই সব উৎস থেকে সৈনিকেরা উৎসাহিত হত সন্দেহ নেই কিন্তু সর্বোপরি নেতাজীর দৈনিক নির্দেশনামাই সেই প্রচণ্ড বিপ্লব বহ্নিতে ইন্ধন যোগাতো। সেই নির্দেশনামার কিছু কিছু পাঠ না করলে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই সেই নির্দেশনামার কিছু কিছু পরিভাষা নীচে দেওয়া হল :

বন্ধুগণ! ১৮৫৭ সালের পর এই প্রথমবার আমরা স্বীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করলাম। বিদেশের বহু শক্তিশালী রাষ্ট্র এ গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করে নিয়েছে। ১৮৫৭ সালের পর এই প্রথবার ভারতেব বাইরের বিশেষতঃ এশিয়ার ও ইউরোপের ভারতীয়েরা স্বদেশের স্বাধীনতার যোদ্ধাদের পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে। ভারতে বিপ্লবের ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অত্যাচারীর নির্দয় শোষণের ফলে ভারতে দুর্ভিক্ষ ও অনাহারের তাণ্ডবলীলা চলেছে, তাই ভাবতবাসিগণকে বিপ্লবের পথে ঠেলে দিচ্ছে। ভারতের স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম আরম্ভ করবার উপযোগী সময় আজ উপস্থিত। স্বদেশে ও বিদেশে অবস্থিত আমার দেশবাসিগণ আর সময় নষ্ট কোর না! তোমরা প্রস্তুত হও এবং এই মূহুর্তেই শেষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হও। পূর্ব এশিয়ার শক্তিশালী মিত্র রাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে আমরা

যথাসাধ্য কাজ করছি। শীঘ্রই আমরা ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করবো এবং ভারতভূমিতে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করবো। তারপর দিল্লী অভিমুখে আমাদের ঐতিহাসিক যাত্রা সুরু করবো। সর্বশেষে ইংরাজরা ভারতবর্ষ ত্যাগ করলেই এ যাত্রা শেষ হতে পারে কিন্তু তার পূর্বে নয়। দিল্লীর বড়লাট ভবনে যেদিন আমাদের জাতীয় পতাকা সগৌরবে উড়তে থাকবে এবং যেদিন ভারতের মুক্তি সেনা প্রাচীন লালকেল্লার অভ্যন্তরে বিজয় উৎসবে মেতে উঠতে পারবে—কেবলমাত্র সেই দিনই এ অভিযানের শেষ হবে।

আর একটি অনুরূপ নির্দেশনামা ঃ

আজাদ হিন্দ ফৌজের কমরেডগণ!

এই বছরের (১৯৪৪) মার্চ মাসের মাঝামাঝি আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রগামী বাহিনী তাদের শক্তিশালী মিত্র রাজকীয় নিপ্পন বাহিনীর সেনাদের সঙ্গে পাশাপাশি যুদ্ধ করতে করতে ভারত-ব্রহ্ম সীমা অতিক্রম করেছে এবং সেই সঙ্গে ভারতের মুক্তি যুদ্ধ ভারতের মাটিতেই সুরু হয়ে গেছে।

বৃটিশ কর্তৃপক্ষ শতাধিক বৎসর ধরে আমাদের নির্মমভাবে লুণ্ঠন করে এবং বিদেশ থেকে ভাড়াটে সৈন্য জোগাড করে আমাদের বিরুদ্ধে বিরাট এক শক্তি নিয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে। ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করার পর আমাদের ন্যায্য দাবীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের সেনা বাহিনী অধিকসংখ্যক এবং উন্নত সাজসজ্জা সম্বলিত কিন্তু মিশ্র ও অসংবদ্ধ শত্রু সৈন্যদের প্রত্যেক যুদ্ধে পরাস্ত করে দিয়েছে।

আমাদের বাহিনী তাদের উন্নততর শিক্ষা ও শৃঙ্খলা এবং করিব কিংবা স্বাধীনতার পথে মরিব এই অমননীয় দৃঢ়তার বলে শীঘ্রই শত্রুর উপর তাদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হয়েছে এবং ওদের নৈতিক বল ক্রমশঃই প্রত্যেক পরাজযের সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে।

চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মধ্যে যুদ্ধ করতে গিয়ে আমাদের সমর নায়ক ও সেনারা

এমনই শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়েছে যে তারা সকলেরই প্রশংসা অর্জন করেছে! রক্ত দিয়ে এবং ত্যাগের মধ্য দিয়ে তারা যে ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছে ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতের সৈন্যদের সেই প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতে হবে।

যখন সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ এবং ইম্ফলের ওপর চূড়ান্ত আক্রমণ স্বরু করার সময় আসন্ন তখন আমরা মুষলধারায় বৃষ্টিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি এবং তখন এক আক্রমণে ইম্ফল দখল করা রণকৌশলের দিক থেকে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এই সব প্রতিবন্ধকের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে আমাদের আক্রমণ দেরী করাতে বাধ্য হতে হয়। আক্রমণ স্থগিত রাখবার পর আমাদের সেনার পক্ষে লাইন বজায় রাখা অসুবিধাজনক হয়ে ওঠে। আরও সুবিধাজনক আস্তানা গাড়বার জন্যে আমাদের সৈন্যদের পশ্চাৎ অপসারণ করাই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাদের সৈন্যবাহিনী সুবিধাজনক আস্তানার দিকে পশ্চাৎ অপসরণ করে। এখন আমরা এই সময় আমাদের আয়োজন সম্পূর্ণ করার কাজে লাগবো যাতে আবহাওয়ার উন্নতি হলে আমরা আবার আক্রমণ স্বরু করতে পারি।

যুদ্ধক্ষেত্রের বিভিন্ন দিকে শত্রুকে পরাজিত করে আমাদের চূড়ান্ত জয়ের ওপর এবং আক্রমণকারী এ্যাংলো-আমেরিকান সৈন্যদের সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধনের ওপর বিশ্বাস দশগুণ বেড়ে গেছে। আমাদের আয়োজন সম্পূর্ণ হলেই আমরা পুনবার শত্রুকে ভীষণভাবে আক্রমণ করতে স্বরু করবো। আমাদের সৈন্য ও কার্যাধ্যক্ষদের অধিকতর যুদ্ধক্ষমতা, অদমনীয় সাহস এবং অবিচলিত কর্তব্য-নিষ্ঠার বলে জয় আমাদের হবেই।

ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে সমস্ত বীর যোদ্ধা আগের যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তাঁদের আত্মা আমাদের অধিকতর বীরত্ব ও সাহসের পথে অনুপ্রাণিত করুক। জয়হিন্দ!

১৯৪৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী প্রথম বৃটিশ বাহিনীর সঙ্ঘে আজাদ-হিন্দ-ফৌজের সঙ্ঘর্ষ সুরু হয়। বৃটিশ বাহিনী আধুনিকতম সব রকম সমর সজ্জায় সজ্জিত থাকলেও এবং প্রচুর সমরোপকরণ মজুত থাকলেও আজাদ-হিন্দ-সেনা বাহিনী একমাত্র হাতিয়ার সম্বল করেই অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করতে থাকে এবং পর পর কয়েকটা যুদ্ধক্ষেত্রে বৃটিশকে পরাজিত করে পিছনে হটিয়ে দেয়। শোনা যায় সামনাসামনি যুদ্ধ করতে গেলে বৃটিশ সৈনিকদের কাছে আজাদী সেনারা রীতিমত আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছিল। সেই জন্য সামনাসামনি যুদ্ধের ওপর জোর না দিয়ে অতর্কিতে আক্রমণ করে এবং অলক্ষ্যিতে বিমান থেকে অজস্র বোমা বর্ষণ করে বৃটিশ বাহিনী আজাদী সেনাদের কাবু করতে চেষ্টা করতে থাকে। একে ত মাল মসলার অভাব, তার ওপর মোটর যানের অভাবে পায়ে হেঁটে পাহাড়-নদী-জঙ্গল অতিক্রম করে, জল-ঝড়-রোদ নীরবে মাথা পেতে নিয়ে, অর্ধাশন অনশন সহ্য করে তাদের অগ্রসর হতে হচ্ছিল তার ওপর বৃটিশের বিশেষ করে আমেরিকানদের এই অজস্র বোমাবর্ষণের ফলে আজাদী সেনারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

ওদের অধীনে সমপরিমাণ বিমানপোত যদি থাকতো তাহলে যুদ্ধের ফলা-ফল কি যে দাঁড়াতো বলা যায় না। একমাত্র অর্থাভাবের জন্যই তারা এই বিমান সংগ্রহ কবতে পারে নি। কিন্তু তবু এই অবস্থাতেই এমন একদিন এসেছিল যে দিন আজাদ হিন্দ সেনা ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে পেরেছিল। মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ হলেন সেই ভাগ্যবান পুরুষ যিনি সর্বপ্রথম অধিকৃত ভারতভূমিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ সম্মান তিনিই প্রথম অর্জন করলেন।

জয় পরাজয়ের প্রশ্ন প্রখানে অবান্তর। কিন্তু এই যে জগতের শ্রেষ্ঠ শক্তি মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে এই যে মুষ্টিমেয় ভারতের মুক্তিকামী সৈনিকের দল সমস্ত

মন প্রাণ ঢেলে—বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামের শক্তি নয়—সমস্ত আত্মার শক্তি দিয়ে দেড়শ' বছরের অত্যাচারের পুঞ্জীভূত বেদনার অগ্নিময় প্রতিধ্বনি তুলে যে জাগিয়ে দিয়ে গেল ভারতের নিদ্রিত শক্তির প্রচণ্ডতাকে তার তুলনা ইতিহাসে মিলবে না। তাই বলি জয় পরাজয়ের প্রশ্ন এখানে ওঠে না—এরা চিরজয়ী অমর যোদ্ধার দল!

দৈনন্দিন যুদ্ধের ইতিহাস জানার কোন প্রয়োজন নেই। কেন না একমাত্র যুদ্ধের সময়ই তাঁর একটা বিশেষ মর্যাদা আছে, যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর সে উত্তেজনা আর তার মধ্য থেকে পাওয়া যাবে না। তবে দুই এক দিনের যুদ্ধের হুকুম নামার সঙ্গে আমাদের পরিচয় থাকা দরকার। যথা:

গোপনীয়

কপি নং ১

২৭শে মার্চ ১৯৪৫

নং ৫৩১ ইউনিট অপারেশন অর্ডার নং ২

মানচিত্র নং ৮৪০।৮ ও ৮৪০।৪

১: ৫০,০০০.

খোঁজ খবর,

(ক) শত্রু: এক ব্রিগেডের মত এক দল যন্ত্র সজ্জিত শত্রু বাহিনী যারা গত মাসের শেষদিকে মিকটিলায় প্রবেশ করেছিল তারা এখনও সেখানে আছে। শত্রু নিয়ানগু ও পাকোকুতে খুব শক্তিশালী সেতুমুখ তৈরী করেছে এবং তাদের আরও মজুত পাঠিয়ে প্রবল করে তুলছে। এই সেতুমুখদ্বয়ে শত্রু সংখ্যা আন্দাজ দুই ব্রিগেডের মত।

আরও জানা গেছে যে শত্রু এক ব্যাটালিয়ন পদাতিক, ১০ খানা ট্যাঙ্ক ও ১০ খানা সাঁজোয়া গাড়ীর সাহায্যে পিনবিন দখল করেছে।

পিনবিনের ১২ মাইল উত্তর-পূর্বে থেডতে টঙ্গথার যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য শত্রুর

রক্ষিত সৈন্যের হদিস পাওয়া গিয়েছে। মিঙ্গিয়ান, টঙ্গথা ও মাহলেঙ্গে শত্রুর শক্তিশালী বিক্ষিপ্ত দলেরও সন্ধান পাওয়া গেছে।

(খ) **নিজস্ব ও মিত্রশক্তির বাহিনী :** শক্তিশালী জাপানী বাহিনী ভীষণভাবে মিক্‌টিলা আক্রমণ করছে এবং শত্রুকে হ্রদের পশ্চিম দিকে জোর করে ঠেলে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

আমাদের রণক্ষেত্রে পিনবিনের ১০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে সিকটানে একদল নতুন 'ঃইডান' এসে পৌঁছেছে।

বিনবিনের ৪ মাইল দক্ষিণে সেট-সেটিওতে খাঞ্জো দল অবস্থান করছে। আরও পশ্চিমে কায়াঙ্ক বেডিং নায়ানগুরাস্তায় একদল নতুন 'বাটা' ৪৫৯ নং দলের কাছ থেকে টঙ্গ্‌জিন ও মায়াউকি নেগালেইনের রক্ষার ভার গ্রহণ করেছে। ইরাবতী নদীর দুই তীরে কানটেটস্থর অগ্রসর বেশ সন্তোষ জনক ভাবেই চলছে।

২। **উদ্দেশ্য :** 'খাঞ্জো' দলের সহযোগিতায় ৫৩১ নং দল আক্রমণ করবে এবং মার্চ ৩০।১১ তারিখের রাত্রিতেই শত্রুর পিনবিনের ঘাঁটি বিধ্বস্ত করে দেবে।

৩। উপায়ঃ প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে প্রত্যেক দল তাদের বর্তমান অবস্থান থেকে নিম্নলিখিত দিনে নিম্নলিখিত স্থানে গিয়ে জড় হবে ঃ—

দল	স্থান	তারিখ
(ক) ৫৪৫নং দল	সিকটিন	রাত্রি ২৯।৩০ মার্চ
(খ) (১) খাঞ্জো দল	ওইন (বিনবিনের ২ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে) বিনবিনের দক্ষিণে টঙ্গ্‌ডতে।	ঐ
(২) ৪[illegible] নং	পিনবিনের দক্ষিণ-পশ্চিমে	ঐ

৩০।৩১ শে মার্চ রাত্রে খাঞ্জো ও ৪৫০ দল তাদের সমাবেশের স্থান থেকে

এগিয়ে গিয়ে ০১০০ ঘণ্টায় পিনবিনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুকে বিধ্বস্ত করে দেবে।

৫৪৫ নং দল পূর্ব রাস্তার থেকে (১) পিনবিন—টাডা (২) পিনবিন খাবেওযা (৩) পিনবিন কামা কেটে দেবার জন্য শক্তিশালী ছোট ছোট দল পাঠিয়ে দেবে। এই ছোট ছোট দল ২৩০০ ঘণ্টায় ৩০।৩১শে মার্চের রাত্রে নিজেদের তৈরী করে রাখবে।

৪৫০ নং দল ও খাঞ্জো দল যখন পিনবিন আক্রমণে ব্যস্ত থাকবে তখন ৫৪৫ নং দল এই রাস্তাগুলো দিয়ে যে কোন শত্রু পালাতে চেষ্টা করলে তাকে হত্যা করবে এবং পূর্ব ও উত্তর পূর্ব থেকে কোন সাহায্য পাঠাবার চেষ্টা করলে তৎক্ষণাৎ বাধা দেবে।

নং ৫৩১ ইউনিট অপারেশন অর্ডার নং ২।

তারা শত্রুর ট্যাঙ্ক নিয়ে যাবার পথ আটকাবার জন্য উপযুক্ত সংখ্যায় মাইন নিয়ে যাবে।

ওইনের দিক থেকে আক্রমণটা খুব শক্তিশালী কামান বাহিনী দিয়ে সাহায্য করতে হবে।

আক্রমণের পরেই কাজ স্রুরু করতে হবে।

আক্রমণ সম্পূর্ণ হবার পর ভোর হবার আগেই ৫৩১ নং দলের সমস্ত উপদলই যেখান থেকে যাত্রা স্রুরু করেছিল সেখানে ফিরে যাবে।

দিনের বেলায় সৈন্যেরা বেশ বিক্ষিপ্তভাবে থাকবে এবং শত্রুর বিমান ও এ, এফ, ভি, এস, এর হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য সব রকম সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

৪। শাসন ব্যবস্থা:

যোগান দেওয়ার পথ নিম্নলিখিতরূপ হবে—

(ক) ৪৫০ নং দল: পোপায়া—ডঙ্গী—ক্রুম রোড (পিনবিনের দক্ষিণ পশ্চিম)

(খ) ৫৪৫ নং দল—পোপায়া—সিকটিন্

যতগুলো গরুরগাড়ী প্রয়োজন হবে দলের লোকেরা স্থানীয় অঞ্চল থেকে তা সংগ্রহ করবে এবং আক্রমণ সমাধা হলে সেগুলো মালিকদের কাছে ফেরৎ দিয়ে দেবে।

রেশন, জল ও অন্যান্য চালান : দলের সমস্ত প্রয়োজন পোপায়ার ডি, কিউ, এম, জি'র নিকট জানাতে হবে তিনি যথাসাধ্য সব ব্যবস্থা করবেন। খুব কম করে সাতদিনের মত শুখ্‌নো রেশন দল কর্তৃক অগ্রসর এলাকার মধ্যে জড় করা যেতে পারে।

এস, এ, এ : ডি, কিউ, এম, জি'র কাছে খুব সামান্য ৩০৩ এস, এ, এ, বলের মজুত আছে। গোলা বারুদ ব্যবহারে দল সমূহকে যথাসম্ভব মিতব্যয়ী হতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

এটি কে মাইন : নির্দিষ্ট সংখ্যার মজুত আছে। শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে দল সমূহকে সাহায্য করবার জন্যে এগুলো পাঠানো হচ্ছে।

চিকিৎসা সম্বন্ধীয় : সমস্ত আহতদের পোপায়াতে পাঠানো হবে।

যেখানে জল ফোটানোর অসুবিধা আছে সেখানে ব্যবহার করবার জন্যে অল্প পরিমাণ ব্লিচিং পাউডার দলদের দেওয়া হবে।

পরস্পর যোগাযোগ :—

৫৪৫ দল দল ও ৫৩১ দল বেতার যোগে।

৫৩১ দলের যুদ্ধক্ষেত্রের মূল শিবির মার্চ ২৯।৩০ রাত্রে পোপায়া থেকে সিকটিনে স্থানান্তরিত হবে।

৫৩১ দলের সাধারণ মূল শিবির মেজর রামস্বরূপের অধীনে পোপায়াতেই থাকবে।

দলসমূহের প্রতি বিশেষ নির্দেশ :

পিনবিনের ওপর আক্রমণ অতর্কিত গরিলা আক্রমণের ধরণেই হবে যাতে

যতটা সম্ভব ক্ষতি করা যেতে পারে এবং তারপর শত্রুকে একেবারে বিতাড়িত করে ফেলতে হবে।

অধিনায়কগণ অনর্থক হতাহতের সংখ্যা যাতে বেশী না হয় তার দিকে দৃষ্টি রেখে খুব সতর্কভাবে সৈন্য প্রয়োগ করবেন।

(২) যেখানে সম্ভব জীবন্ত বন্দী কিছু কিছু ফিরিয়ে আনতে হবে।

(৩) শত্রুর শিবিরে যত কিছু কাগজ নথিপত্র এবং দল নির্দেশক ব্যাজ পাওয়া যাবে সব নিয়ে আসতে হবে।

বিলি করণ :

৪৫০ নং দল—১ কর্ণেল শাহ নওয়াজ খান

৫৪৫ „ „—১ কমাণ্ডার ৫৩২ নং দল

৫০ „ „—১

অফিস কপি—১

স্বাক্ষরিত।

যদিও উপরের হুকুম নামার মধ্যে অনেক কিছুই আমাদের কাছে দুর্বোধ্য তবুও এর থেকে কিছু কিছু ধারণা আমরা করতে পারি। আই, এন, এ, বিচারের সময় সময় এই ধরণের হুকুমনামা কিছু কিছু প্রদর্শিত হয়েছিল।

এই সব হুকুমনামা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে যুদ্ধের শেষ দিকে আজাদ-হিন্দ-ফৌজের মধ্যে কোন কোন সেনা বিশ্বাসভঙ্গ করে নিজের দলেরই শত্রুতা সাধন করেছিল। এরকম প্রত্যেক দলেই হয়ে থাকে, সেটা কিছু আশ্চর্য নয়। তবে তাদের বিরুদ্ধে কিরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো তা জানতে গেলে নেতাজীর একখানি নির্দেশনামা অনুধাবন করলেই বুঝতে পারা যাবে। যথা :—

বন্ধুগণ !

কাপুরুষত্ব ও বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে আমাদের আন্তরিক ঘৃণা, বিতৃষ্ণা ও রোষ প্রকাশ করবার জন্যে, পূর্ব হতে নির্দিষ্ট এক দিনে প্রত্যেক আজাদ-হিন্দ-ফৌজ শিবিরে একটি করে বিশেষ অনুষ্ঠান হবে। এই অনুষ্ঠান সমস্ত কর্মাধ্যক্ষ ও সাধারণ সৈনিক অবশ্যই যোগদান করবে।

এই অনুষ্ঠানের কার্যলিপি হিসাবে যাতে এই অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গসুন্দর হয় তার জন্য প্রত্যেক শিবিরই নিজ নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী অনুষ্ঠানলিপি প্রস্তুত করতে পারবে। সাধারণভাবে একটা কার্যসূচির খসড়া নিম্নে সংযুক্ত করা হল।

(ক) ভীরুতা ও বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে ঘৃণা জানিয়ে কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা ও পাঠ।

(খ) এই মর্মে নাটক রচনা ও অভিনয়।

(গ) কার্ডবোড, ঘাস বা মাটি বা যে কোন সুবিধাজনক পদার্থ দিয়ে এই সব বিশ্বাসঘাতকদের (রিয়াজ, মদন, সারবারী, দে, মহম্মদ বকশ এবং অন্যান্য) মানুষ বা জন্তুর অনুকরণে প্রতিকৃতি তৈরী করা হবে এবং শিবিরের প্রত্যেকেই এই বিশ্বাসঘাতকদের ওপর নিজ নিজ ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার পূর্ণ প্রকাশ প্রদর্শন করবে।

(ঘ) অতীত ভারতের বীরপুরুষদের গৌরবগাঁথা অবলম্বনে এবং বর্তমান স্বাধীনতা সংগ্রামে আজাদ-হিন্দ বাহিনীর সৈন্যদের বীরত্বব্যঞ্জক কার্যধারার প্রশংসা করে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হবে।

(ঙ) সর্বশেষে জাতীয় সঙ্গীত গান ও সমবেত জয়ধ্বনি দিয়ে অনুষ্ঠান সাঙ্গ করা হবে।

যে শিবির সেরা অনুষ্ঠান করবে তার জন্য বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে।

ব্রহ্মদেশ (স্বাঃ) সুভাষচন্দ্র বসু

১৩, ৩, ১৯৪৫, সর্বাধিনায়ক

আজাদ-হিন্দ-ফৌজ

এ ত গেল সাধারণ যুদ্ধরত সৈন্যদের কথা। যারা বিশ্বাসঘাতকতা করতো তাদের শাস্তি ছিল প্রাণদণ্ড। অবশ্য সব সময়েই যে প্রাণদণ্ড হ্ত তা নয়, অন্যান্য শাস্তিরও ব্যবস্থা ছিল।

একদিকে যেমন ভীরুতা ও অবাধ্যতার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা ছিল অন্যদিকে তেমনি শৌর্যবীর্য প্রদর্শনের জন্যে পুরস্কার ও বিশেষ উপাধিরও ব্যবস্থা ছিল। কয়েকটি বিশিষ্ট সম্মান ও ভূষণের নাম—(১) শহীদ-ই-ভারত (২) শের-ই-হিন্দ (৩) সর্দার-ই-জঙ্গ্ (৪) ভাই-ও-হিন্দ (৫) তজ্ঘ-ই-বাহাদুরী (৬) তজ্ঘ-ই-শত্রুনাশ (৭) সনদ্-ই-বাহাদুরী।

তবে, তজ্ঘ-ই-শত্রুনাশ আজাদ-হিন্দ-ফৌজের বাইরেও যে কোন ব্যক্তি যে ভারতের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করবে তাকেও দেওয়া যেতে পারে বলে স্থির হয়।

এইবার আমাদের আজাদ-হিন্দ-ফৌজের বিশেষ করে নতুন আগন্তুকদের আভ্যন্তরিক গঠন-প্রণালী সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। এই বিষয় জানতে গেলে বিচারালয়ে প্রদর্শিত শাহ্ নওয়াজ খানের একটি নির্দেশনামাই যথেষ্ট বলে মনে হয়। নির্দেশনামাটি এইরূপ :

নং এস ১০১ জি

একান্ত গোপনীয়।

হেড কোয়ার্টার্স, সুপ্রীম কম্যাণ্ড

আই, এন, এ

টু,

শোনান-টো ৮ই আগষ্ট ১৯৪৩,

হেড কোয়ার্টার্স নং ১ ডিভি, আই, এন, এ,

কমড, রি-ইন ফোর্সমেণ্ট গ্রুপ,

হেড কোয়ার্টার্স, হিকারি কিকান।

ব্রহ্মদেশস্থিত ভারতীয় সৈন্যদের অভ্যর্থনা ও তত্ত্বাবধানের পরিকল্পনার এক কপি এই সঙ্গে পাঠানো হল।

(স্বাঃ) শাহ্ নওয়াজ খান, লেফ্টেঃ কর্ণেল

সি, জি, এস, হেড কোয়ার্টার্স সুপ্রীম কম্যাণ্ড, আই, এন, এ,

একান্ত গোপনীয়।

ব্রহ্মদেশস্থিত ভারতীয় সৈন্যদের অভ্যর্থনা ও তত্ত্বাবধানের পরিকল্পনা

সাধারণ ঃ

আশা করা যাচ্ছে ভারত ব্রহ্ম সীমান্তে যুদ্ধ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে কিছু ভারতীয় সৈন্য আমাদের দিকে এসে যোগ দেবে। অপরপক্ষে যুদ্ধের সময় কয়েকজন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। ভাষাগত এবং অন্যান্য অসুবিধার ফলে সম্মুখ ক্ষেত্রের জাপানী সৈন্যদের পক্ষে ওদের ঠিকমত নিরূপণ করা ও কাজ চালানো খুবই কষ্টকব হয়ে পড়বে। আমাদের প্রচার কার্যের চূড়ান্ত ফল লাভ করবার জন্য আমাদের এই সব সৈন্যদের সঙ্গে খুব সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। সামান্যমাত্র স্খলনের জন্য গুরুদণ্ড দিতে হতে পারে।

উদ্দেশ্য—এই পবিকল্পনার উদ্দেশ্য এই এই বিষয়ে সন্তোষজনক ব্যবহার প্রবর্তন করা—

(১) অভ্যর্থনা
(২) খাদ্যব্যবস্থা, সাজসজ্জা ও আশ্রয়
(৩) মানসিক শিক্ষা
(৪) সংগঠন।

(ক)

অভ্যর্থনা ঃ

১। সম্মুখক্ষেত্র ঃ আশা করা যাচ্ছে সম্মুখ ক্ষেত্রে স্পেশ্যাল সার্ভিস গ্রুপ এবং ইনটেলিজেন্স গ্রুপ জাপানীদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে কাজ করবে। তাদের কর্তব্যের একটি অংশ হবে এই সব লোকদের ফরওয়ার্ড কালেকটিং পোষ্টে পাঠিয়ে দেওয়া।

(খ)

রি-ইন ফোর্সমেণ্টের গ্রুপের অংশ।

২। রি-ইনফোর্সমেণ্ট গ্রুপের এক অংশ দিয়ে ফরওয়ার্ড কালেকটিং পোষ্ট

গঠিত হবে। এদের অবস্থান হবে জাপানী রেজিমেণ্টের হেড কোয়ার্টারের কাছাকাছি। এর এই এই ক্ষমতা থাকবে—

(১) যে সমস্ত ভারতীয় সৈন্য আসবে তাদের খাদ্যব্যবস্থা করা

(২) প্রয়োজনীয় ডাক্তারী সাহায্য করা এবং গুরুতর আহতদেব এ্যাডভান্স বা মেইন কালেকটিং পোষ্টে স্থানান্তরিত কবা।

(৩) নতুন আগত সৈন্যদের মনে ভাল ধারণার স্থষ্টি করা ও তাদের উৎসাহ দেওয়া।

পবিকল্পিত প্রতিষ্ঠান ঃ –

কম্যাণ্ডার—	১	ক্যাপ্টেন বা লেফ্‌টেন্যাণ্ট
এ্যাসিসট্যাণ্টস্—	২	সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্ট
প্রোভোষ্ট—	৪	হাবিলদার ১, সিপাই—৩
এ্যাডমিনিসট্রেটিভ স্টাফ্—	৫	হাবিলদার ১
		সিপাই ৪
মেডিক্যাল অফিসার—	১	লেফ্‌টেন্যাণ্ট
নার্সিং অর্ডার্লী—	৩	

তাদের সঙ্গে উপযুক্ত ডাক্তারী সাজসরঞ্জাম থাকবে এবং এক সঙ্গে ১০ লোককে খাওয়াবার মত রাঁধবার বাসনাদি থাকবে।

এ্যাডভান্স কালেকটিং পোষ্ট ঃ—

ডিভিশানাল হেড কোয়ার্টার্সের কাছাকাছি কোথাও অবস্থিত থাকবে।

কর্তব্য ঃ—

১। এই লোকদের খাওয়ানো।

২। আহতদের আরও চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং জরুরী অপারেশন।

৩। গুরুতর অবস্থা বিশেষে মেইন কালেকটিং পোষ্টে স্থানান্তরিত করা।

৪ মেইন কালেকটিং পোষ্টে পাঠাবার সর্বরকম ব্যবস্থা করা।

সংগঠন ঃ—

কম্যাণ্ডার—	১	মেজর অথবা ক্যাপ্টেন	
এ্যাসিসট্যাণ্টস—	৩	ক্যাপ্টেন	
প্রোভোষ্ট—	২০	সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্ট	১
		হাবিলদার	২
		সিপাই	১৭
এ্যাডমিনিসট্রেটিভ স্টাফ্—	১৫	হাবিলদার	২
		সিপাই	১৩
মেডিক্যাল অফিসার—	২	ক্যাপ্টেন বা লেফটেন্যাণ্ট	
নার্সিং অর্ডালী	১০		

মেইন কালেকটিং পোষ্ট —

আই, এন, এ'র সুপ্রীম হেড কোয়ার্টার্সের কাছে স্থাপিত হবে।

কর্তব্য ঃ—

১। এই ব্যক্তিদের থাকবার ব্যবস্থা করা।

২। কাপড় জামা।

৩। জাতীয়তার স্ফুরণের জন্য মানসিক শিক্ষাব্যবস্থা।

৪। এদের বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা অর্থাৎ ঃ—

স্তর 'ক'—যারা এই আন্দোলন সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে এসেছে।

স্তর 'খ'—যাদের এ সম্বন্ধে জ্ঞান নেই কিন্তু এখন আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে ইচ্ছুক।

স্তর 'গ'— যারা জাতীয় বাহিনীতে যোগ দিতে রাজী নয়!

রি-ইনফোর্সমেণ্টের কার্যাধ্যক্ষের কাছ থেকে এই সব বিবরণ পেয়ে সুপ্রীম হেড কোয়ার্টার ব্যবস্থা করবে—

১। 'ক' ও 'খ' স্তরের লোকদের সাজ সরঞ্জামে সজ্জিত করতে এবং--

২। 'গ' স্তরের লোকদের যুদ্ধবন্দী হিসাবে জাপানী কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিতে।

সংগঠন :—

১। হেড কোয়ার্টার্স রি-ইনফোর্সমেণ্ট গ্রুপ। রি-ইনফোর্সমেণ্ট গ্রুপের কম্যাণ্ডার মেইন কালেকটিং পোষ্ট পরিচালনা করবেন।)

২। মেডিক্যাল (বেস হাঁসপাতালের কাছে থাকাই বাঞ্ছনীয়)

মেডিক্যাল কর্মচারী— ৩

নার্সিং অর্ডালী— ১৫

৩। কৃষ্টি ও উপদেশ বিভাগের চারজন কর্মচারী মানসিক শিক্ষার জন্য নিযুক্ত থাকবেন।

৪। এক কপি এম, পি বা সামরিক পুলিশ (যদি এ সম্ভব না হয় তাহলে রি-ইন ফোর্সমেণ্টের কার্যাধ্যক্ষ নিজের লোক দিয়ে পুলিশের কাজ চালাবেন। যদি প্রয়োজন বোধ করেন তাহলে কাছাকাছি কোন প্লেটুন বা কোম্পানীর লোকদের এই কাজে বাধ্য করবেন।)

এই পরিকল্পনা কার্যপদ্ধতির একটা নক্সা এই সঙ্গে দেওয়া গেল। সম্মুখ লাইনের শক্তি অনুযায়ী নিযুক্ত লোকের সংখ্যা নির্ভর করবে এবং যোগাযোগের ব্যবস্থার ওপরও নির্ভর করবে।

এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হবার আগে হিকারী কিকান দয়া করে এই প্রতিশ্রুতি দেবেন যে,

১। সমস্ত জাপানী কর্মচারীর জাপানী গভর্ণমেণ্টের ভারত, আজাদ-হিন্দ-ফৌজ এবং এই নবাগত ভারতীয় সৈন্যদের সম্বন্ধে নীতি সম্পূর্ণ জানা আছে।

২। তাঁরা আজাদ-হিন্দ-ফৌজকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন এবং তাঁরা

এই পরিকল্পনা সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হবার জন্য সব রকম সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করবেন।

যাতায়াত ব্যবস্থা ঃ—

সাধারণতঃ জাপানী চালানের যোগাযোগ ব্যবস্থাই ব্যবহার করা হবে। যেখানে সম্ভব এই সব লোকদের এ্যাডভান্স বা মেইন কালেকটিং পোষ্টে পাঠাবার জন্য রেলগাড়ী ব্যবহৃত হবে।

এই পরিকল্পনার খসড়ার সঙ্গে যে নক্সা সংযুক্ত ছিল সেটা এর সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হল না, অপ্রয়োজন বোধে!

উক্ত নির্দেশনামা থেকে আমরা দুটো প্রয়োজনীর বিষয় জানতে পারি। প্রথমতঃ নবাগত সৈনিকদের প্রতি আজাদ-হিন্দ সরকারের ব্যবহার এবং দ্বিতীয়তঃ এই সেনা বাহিনী গঠনে জাপানীদের সঙ্গে প্রকৃত সম্বন্ধ। পদমর্যাদা ও পদবিভাগে আজাদ-হিন্দ বাহিনীর সঙ্গে বৃটিশ বাহিনীর বিশেষ কোন তফাৎ নেই, বাহিনী গঠনের পূর্বের অবস্থাটাই প্রকৃত আলোচনার বিষয়। তবে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ না করলে আমাদের এ কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, সেটি হল বালক সেনা বাহিনীর কথা। ১২ থেকে ১৮ বছর বয়সের ছেলে মেয়েদের নিয়ে এই বালক সেনা বাহিনী গঠিত হয়। শোনা যায় এই সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেবার জন্যে দলে দলে ছেলে মেয়ে এসে নেতাজীর কাছে অনুনয় বিনয় করতো। এরা বীর যোদ্ধার মত বন-জঙ্গল পাহাড় পর্বত পার হয়ে বহুক্ষেত্রে যুদ্ধতে নানা-রকম সাহায্য করতো। শুধু অর্থকরী বিদ্যা না শিখিয়ে এদের জাতীয় ভাবাপন্ন হয়ে দেশের শিল্প প্রসারের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষিত করে তোলা হত। ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতে এদের একটা বড় স্থান থাকবে—মস্তবড় এক উঁচু আদর্শ এরা তুলে ধরবে দেশের সামনে।

এ সমস্ত গেল আভ্যন্তরিক বিধিব্যবস্থার কথা কিন্তু বহির্জগতের সঙ্গে এই

আজাদ-হিন্দ-সরকারের এবং বিশেষ করে নেতাজীর সঙ্গে জাপানীদের কি সম্বন্ধ ছিল সেটা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। পাশ্চাত্যদেশে জেনারেল দ্যগল এবং মার্শাল টিটোর বীরত্ব কাহিনী এবং দেশপ্রেমের ভূয়সী প্রশংসা শোনা যায় বৃটিশের মুখে বৃটিশের বন্ধু আমেরিকার মুখে। অথচ তারাই বলে নেতাজী নাকি দেশদ্রোহী, ফিফ্‌থ কলমিষ্ট, জাপানী এজেণ্ট ইত্যাদি। এদের এই মিথ্যা অতিরঞ্জিত ব্যাপক প্রচারকার্যের ফলে আমাদেরও অনেকের মধ্যে ধারণা হয়েছিল যে নেতাজী দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করলেও তিনি নিশ্চয় জাপানীদের অধীনেই তা করছেন। কিন্তু এই ধারণা যে কতবড় ভুল এবং নেতাজী জাপানীদের অধীনে সংগ্রাম করা ত দূরের কথা জাপানী শ্রেষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে একইভাবে কতখানি সম্মান যে পেয়ে এসেছেন তার সত্য বিবরণী পাঠ করলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। শুধু জাপান কেন, জার্মানীও তাঁকে স্বাধীন রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক হিসাবে ন্যায্য সম্মানের অধিকারী করেছে। মার্শাল টিটো বা জেনারেল দ্যগলের সঙ্গে তাঁর কোনও রকম তুলনা চলে না। তাঁরা মিত্রশক্তির সাহায্যে হৃত স্বাধীনতাকে পুনরায় উদ্ধার করতে চেষ্টা করেছিলেন আর নেতাজী এক স্বাধীন রাষ্ট্রের সর্বাধি-নায়ক হিসাবে সংগ্রাম চালিয়েছেন সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের সঙ্গে, সমগ্র ভারতের স্বাধীনতার জন্যে। যদি তুলনাই করতে হয় তাহলে ইটালীর গ্যারিবল্ডী, আমেরিকার জর্জ-ওয়াশিংটন এবং রাশিয়ার লেনিনের নামই করা যেতে পারে। তবে প্রভেদ এই যে তাঁরা তাঁদের কার্যে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন আর ভারতের সে শুভদিন আসতে আর কিছুদিন দেরী মাত্র! তবে এ শুধু কল্পনার কথা নয় নেতাজী জাপানীদের কাছ থেকে কতখানি সম্মান যে পেয়েছিলেন তার আংশিক প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নলিখিত পত্রালাপের মধ্য থেকে।

আজাদ-হিন্দ-ফৌজ হুকুমনামা

লেঃ কঃ হাবিব-উর-রহমান, সরকারী প্রধান কর্মকর্তা

ব্রহ্মদেশ নং ১৩ দল ৫, ৯, ৪৪,

৩৩৪। ব্রহ্মদেশের পররাষ্ট্র সচিব মহামান্য থাকিন্ মু, নেতাজী সপ্তাহ পালন উপলক্ষে ৭ই জুলাই ১৯৪৪ সালে মহামান্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্দেশ্যে এই অভিনন্দন পাঠিয়েছেন।

হে মহামান্য '৯৪৩ সালে ৪ঠা জুলাই ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের নেতৃত্বভার কৃতিত্বের সঙ্গে গ্রহণ করবার পর এত সব স্মরণীয় ঘটনা একটার পর একটা সংঘটিত হয়েছে যে বিশ্বাস করা যাচ্ছে না যে এরই মধ্যে একটা বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। অল্পদিনের মধ্যেই আপনার সাময়িক গভর্ণমেণ্ট শোনান থেকে বর্তমান বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার রণক্ষেত্রের পুরোভাগে যে দেশ সেই ব্রহ্মদেশে স্থানান্তরিত হওয়া, শুধু ভারতবর্ষ নয় সমগ্র পূর্ব এশিয়ার একটা সৌভাগ্যের নিদর্শন. এবং হে মহামান্য আপনি চলার পথে বিশ্রামের জন্য কখনও থামতে জানেন নি।

এই অনির্বান উৎসাহ উচ্চ ও নীচ পদযুক্ত সমস্ত জাতীয়-সেনা-বাহিনী এবং তার সঙ্গে ঝাঁসী রাণী বাহিনীর পক্ষে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যাদের সংগ্রামের শক্তি দিন দিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। হে মহামান্য গত বছরে আপনার দেশবাসিদের দর্শনীয় সাফল্য আপনারই স্বাধীনতা অর্জনের অদম্য স্পৃহা ও পূর্ব এশিয়ার চূড়ান্ত জয়লাভে অক্ষুণ্ণ বিশ্বাসেরই ফল।

মহামান্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রত্যুত্তর

হে মহামান্য ঃ—

জুলাই ৭ তারিখে আপনার সহৃদয়, অভিনন্দন পত্রের উত্তরে, সাময়িক সরকাব, জাতীয়-সেনা-বাহিনী, ঝাঁসী রাণী বাহিনী ও আমার নিজের তরফ থেকে আন্তবিক ধন্যবাদ জানাতে আজ্ঞা করুন।

আমাদের মুক্তি সংগ্রামে শুভেচ্ছার জন্য স্বাধীন ব্রহ্মের অধিবাসীরা এবং সরকার পক্ষ আমার ধন্যবাদার্হ।

হে মহামান্য আপনাকে আমি জানাতে চাই যে আমাদের সাময়িক সরকার শোনান থেকে ব্রহ্মদেশে স্থানান্তরিত হবার পর ব্রহ্ম সরকার ও অধিবাসীরা যে সাহচর্য ও সহানুভূতি দেখিয়েছেন তা সর্বান্তঃ করণে আজাদ-হিন্দ-সরকার এবং ত্রিশ লক্ষ ভারতবাসী অভিনন্দিত করছেন।

ব্রহ্ম অধিবাসী ও ব্রহ্ম-সরকারের সাহায্যের বলেই আজাদ-হিন্দ বাহিনী ভারত ব্রহ্ম সীমান্তে পৌছতে এবং ভারতের এ্যাংলো—আমেরিকানদের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে অভিযান চালাতে সক্ষম হয়েছে।

এটা জেনে আমি খুবই আনন্দিত বোধ করছি যে বর্তমানে জাতীয় সেনা বাহিনী ব্রহ্ম বাহিনীর সাথে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তাদের এক উদ্দেশ্য—এশিয়ার স্বাধীনতা ব্রহ্মের স্বাধীনতা, তথা ভারতের স্বাধীনতার জন্য একই শত্রু এ্যাংলো—আমেরিকানদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে।

হে মহামান্য আপনার প্রতি গভীর সম্মান জানাই।

জাপানী পররাষ্ট্র সচিবের প্রতি নেতাজীর বাণী

জাপানী পররাষ্ট্র সচিব মহামান্য মামারু শিঙ্গামিংস্থর নিকট নেতাজী নিম্নলিখিত বাণী প্রেরণ করেন—

হে মহামান্য পুনর্বার আপনার পররাষ্ট্র সচিবের পদ তথা বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার মন্ত্রিত্ব পদ গ্রহণের জন্য আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে ইচ্ছা প্রকাশ করছি! হে মহামান্য আপনার রাজনীতি ও কূটনীতিতে অনন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হওয়ায় আপনি আপনার পদে ফিরে আসায় আমি অভুতপূর্ব আনন্দ বোধ করছি!

এই সুযোগে, হে মহামান্য আপনাকে পুনর্বার আশ্বাস দিচ্ছি যে যদিও খুবই বিপজ্জনক সময় আমাদের আসন্ন তথাপি আমাদের যুক্ত জয়লাভ সম্পাদিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা সকল অবস্থায় জাপানের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাবো।

মহামান্য মামাক্ক শিঙ্গামিংস্থ নেতাজীকে নিম্নলিখিত উত্তর প্রেরণ করেন—

হে মহামান্য আপনার সহৃদয় অভিনন্দন পত্রের জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই সঙ্কটময় মুহূর্তে আপনার সর্বান্তরিক সাহচর্যের আশ্বাস আমি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করছি।

আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে যে আমরা আমাদের সাধারণ উদ্দেশ্যে সফলকাম হব এবং হে মহামান্য আপনার বিজ্ঞ ও সার্থক নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিণামে বিজয় মুকুটে ভূষিত হবে। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মহামান্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও থাইল্যাণ্ডের (শ্যাম রাজ্যের) প্রধান মন্ত্রী মহামান্য কভিট আভাইওঙ্গসীর মধ্যে নিম্নলিখিত তার-বিনিময় হয়—

নেতাজীর তার

হে মহামান্য আপনার প্রধান মন্ত্রিত্ব পদ গ্রহণের উদ্দেশ্যে সমস্ত মুক্তিকামী ভারতবাসী, আজাদ-হিন্দ সাময়িক সরকার, আজাদ-হিন্দ-বাহিনী, ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ ও আমার পক্ষ থেকে আমি আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আমি এই সুযোগে আপনাকে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমাদের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের এই যুক্ত সংগ্রামে আমরা ভারতীয়েরা থাইল্যাণ্ডের সরকার ও জনসাধারণের সঙ্গে সর্বান্তঃকরণে সাহচর্য করতে প্রস্তুত আছি। আমি আশা করি ইতিমধ্যেই স্বাধীন ভারত ও থাইল্যাণ্ডের মধ্যে কৃষ্টি ও রাজনীতিগত যে সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে তা আপনার মন্ত্রিত্বকালে আরও সুদৃঢ় হবে। থাই জাতির নেতা হিসাবে হে মহামান্য আপনার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি এবং অনন্ত শ্রদ্ধা জানাই—সুভাষচন্দ্র বসু সর্বাধিনায়ক সাময়িক আজাদ-হিন্দ সরকার।

মহামান্য মেজর আভাইওঙ্গসীর উত্তর

আপনার অভিনন্দনজ্ঞাপক তারের জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

থাইল্যাণ্ড অধিবাসী ও থাইল্যাণ্ড সরকার মুক্তিকামী ভারতবাসিদের উচ্চাশা সর্ববিষয়ে সমর্থন করে এবং ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে সর্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। হে মহামান্য আমি আপনার কাছে এই প্রতিশ্রুতি দিতে চাই যে স্বাধীন ভারত ও থাইল্যাণ্ডের মধ্যে কৃষ্টি ও রাজনীতিগত সম্বন্ধকে আরও সুদৃঢ় করবার জন্যে আমি বরাবরই চেষ্টিত থাকবো। হে মহামান্য আপনার মহৎ চেষ্টার জন্য এবং আজাদ-হিন্দ-ফৌজের সাফল্যের জন্য থাইবাসিদের নামে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। শীঘ্রই ভারতের স্বাধীনতা সম্পাদিত হোক! এই সুযোগ গ্রহণ করে হে মহামান্য আপনাকে আমার সর্বোচ্চ সম্মান জানাই!

পত্রালাপের মধ্য দিয়ে জাপান ও থাইল্যাণ্ডের সঙ্গে আজাদ-হিন্দ-সরকারের এবং বিশেষ করে মহামান্য নেতাজীর সম্বন্ধ আর স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলবার বোধ হয় কিছু নেই। আর জার্মানীর কথা ত পূর্বেই উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে জার্মানীতে হিটলারের যে সম্মান ও পদ, স্বয়ং হিটলার নেতাজীকে ভারতবর্ষের পক্ষে সেই সম্মান প্রদান করেছিলেন—ফুয়েরার অব ইণ্ডিয়া সম্মানে ভূষিত করেছিলেন।

কোলকাতায় অনুষ্ঠিত সুভাষসপ্তাহে মেজর-জেনারেল শাহ নওয়াজ কয়েকটি সাম্প্রতিক বক্তৃতায় বলেছেন যে জাপানী সমরনায়কগণ নেতাজীর সামরিক বুদ্ধি ও কৌশলের ওপর এত বিশ্বাস করতেন যে তাঁরা অনেক সঙ্কট সময়ে কোন কৌশল অবলম্বন করবার আগে তাঁর সামনে তাঁদের পরিকল্পনার কথা উত্থাপন করে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এবং অনেক সময়ে দেখা গেছে নেতাজী তাঁর অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে তাঁদের সেই কৌশলের আমূল পরিবর্তন করে নূতন পথের সন্ধান দিয়ে দিয়েছেন। জাপানী সমরনায়কগণ অতি আনন্দের সঙ্গে এবং মুগ্ধ হৃদয়ে তাঁর সেই পরামর্শ গ্রহণ করেছেন।

তিনি আরও বলেছেন যে আজাদ-হিন্দ সেনাবাহিনী গঠন করার পূর্বে জাপানী জেনারল তারাওচী বলেছিলেন যে বৃটিশের ভাড়াটে ভারতীয় সৈন্যরা আজ জাতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিচ্ছে সুতরাং বীরত্বে, কর্মক্ষমতায় এবং সহনশীলতায় তারা জাপানের সমকক্ষ হতে পারে না। তাছাড়া জাপান এখন প্রভূত শক্তিশালী, সে আজাদ-হিন্দ-সেনার সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করে না। তার উত্তরে নেতাজী বলেছিলেন যে অন্য দেশের সেনাবাহিনীর সাহায্যে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করা দাসত্বের চেয়েও আরও ঘৃণ্য। তারা যতই দুর্বল হোক ভারতীয় সেনারাই ভারতেব স্বাধীনতা সংগ্রামে বুক পেতে দেবে · এগিয়ে যাবে এবং ভারতের পুণ্য ভূমিতে যে প্রথম রক্তপাত হবে সে রক্ত হবে আজাদ-হিন্দ সৈনিকের।

নেতাজী যখন আজাদ-হিন্দ-সেনাবাহিনী সংগঠন করেছিলেন সেই সময় জাপানীদের হাতে বহু ভারতীয় বন্দী ছিল। তিনি জাপানীদের তাদেরকে মুক্তি দিতে হুকুম করেন। জাপানীরা জবাব দেয় তারা জাপানীদের হাতে বন্দী হয়েছে ভারতীয় নেতার হুকুমে তাদের ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়। তার প্রত্যুত্তরে নেতাজী জাপানী কম্যাণ্ডারকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি ভারতবাসীর স্বাধীনতার জন্যই বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছেন, সেইরকম যদি কোন কারণ ঘটে তিনি জাপানীর বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে দ্বিধা করবেন না। এর পর জাপানী সমরদপ্তর থেকে হুকুম আসে যে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের হুকুমনামা যেন স্বয়ং মিকাডোর হুকুমনামার মতই পালিত হয়।

আর একবার, এক জাপানী সমর দপ্তরের কর্মচারী নেতাজীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে উপযুক্ত পরিচয়পত্র কিছু ছিল না। সেইজন্য যতদিন না পর্যন্ত তিনি ফিরে গিয়ে উপযুক্ত পরিচয় পত্র নিয়ে আসেন নেতাজী তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে রাজী হন নি। এমনি ভাবেই তিনি নিজের এবং স্বাধীন ভারতের মর্যাদা রক্ষা করে চলতেন।

আজাদ-হিন্দ-ফৌজ টোকিও ক্যাডেট নেতাজীর আর একটি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। স্থানীয় শিক্ষাকেন্দ্রের ওপর কেবল ভরসা না রেখে আরও উচ্চতর সামরিক শিক্ষার জন্য নেতাজী ৪৫ জন ভারতীয় তরুণকে টোকিওতে পাঠিয়েছিলেন। এই দলে হিন্দু, মুসলমান এই উভয় জাতের এবং সর্ব প্রদেশের (বেশীর ভাগই বাঙ্গালী) যুবক ছিল। এঁদের অধিকাংশের বয়সই কুড়িব নীচে। প্রথমে মালয়েতে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। সেই বিজ্ঞাপনের উত্তরে যাঁরা আবেদন করেছিলেন তাদের মধ্য থেকে ৪৫জনকে মনোনীত করে পাঠানো হয়। এই দল দুভাগে ভাগ করে টোকিওতে পাঠানো হয়। প্রথম ভাগে ১৯৪৪ সালে মার্চ মাসে ৩৫ জন ও সেপ্টেম্বার মাসে বাকী দশজন যাত্রা করেন। তবে দ্বিতীয় দল যখন যাচ্ছিল তখন শত্রুর টর্পেডো আক্রমণে জাহাজডুবি হওয়ার ফলে বিষেণ সিং নামে একজন প্রাণ হারান। বাকী সকলে জাপানীদের সাহায্যে ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ ঘুরে টোকিওতে গিয়ে পৌছান।

টোকিওতে ভারতীয়, চৈনিক, ও জাপানী শিক্ষানবীশদের একই শিক্ষাকেন্দ্রে একই সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হত। শিক্ষার মাধ্যম ছিল জাপানী ভাষা। সেই সঙ্গে জাপানের ইতিহাসও পড়তে হত। তবে জাপানীরা ভারতীয় যুবকদের সঙ্গে স্বাধীন দেশের অধিবাসীর মতই ব্যবহার করতো। টোকিওস্থিত ভারতীয়দের সঙ্গে তাঁরা ইচ্ছামত মিশতে পারতেন। ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৫ সালে জাপানীরা আত্মসমর্পণ করার পর তাদের এই শিক্ষাকেন্দ্র ভেঙ্গে দেওযা হয়। তখন তারা বৃটিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তারপর আমেরিকানদের সহযোগিতায় ভারতে ফিরে আসেন। তাঁদের মুখে শোনা গেছে যে বৃটিশ অফিসারগণ তাদের সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করলেও আমেরিকানরা তাঁদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছে। তাঁরা আরও বলেছেন যে জাপানীরা আত্মসমর্পণের পর তাদের

নাকি বলেছিল যে—'আমরা আপনাদের পরাজয়ের কারণ হওয়ার জন্য দুঃখিত।'

ভারত প্রত্যাগত জনৈক ক্যাডেটের কাছে নেতাজী-লিখিত একখানি পত্রের অনুলিপি পাওয়া গেছে, তার পরিভাষা দেওয়া গেল—

আর্জি হুকুমৎ আজাদী হিন্দ্ ফুকুওকা

২৯-১১-৪৪

আমার প্রিয় পুত্রগণ,

নিপ্পনের মাটি ত্যাগ করার আগে আমি তোমাদের ভালবাসা ও তোমাদের কার্যে সফলতার জন্যে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমার নিজের কোন পুত্র নেই কিন্তু তোমরা আমার পুত্রেরও বেশী কারণ তোমরা যে উদ্দেশ্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছো আমারও জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য তাই- সে উদ্দেশ্য ভারতমাতার স্বাধীনতা। এ বিশ্বাস আমার আছে তোমরা তোমাদের আদর্শ ও ভারতমাতার প্রতি নিষ্ঠাবান থাকবে।

যাবার আগে তোমাদের সঙ্গে দেখা না করতে পারায় আমি দুঃখিত। কিন্তু তোমরা জানো আত্মার মধ্য দিয়ে সর্বদাই আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। ভগবান তোমাদের আশীর্বাদ করুন। জয় হিন্দ।

সুভাষচন্দ্র বসু।

সম্প্রতি নেতাজীর মালয়ে প্রদত্ত এক বক্তৃতা প্রকাশিত হয়েছে। এই বক্তৃতার দিন হল ২৫শে অক্টোবর ১৯৪৩। এই বক্তৃতাটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে বোধ হওয়ায় এর সারাংশ উদ্ধৃত করে দেওয়া হল।

বন্ধুগণ! প্রথমেই যে ভ্রাতা ও ভগিনীগণ মালয়ের বিভিন্ন দিক থেকে

এই সভায় এসে মিলিত হয়েছেন তাঁদের আমার আন্তরিক সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

আমি বেশী কথা বলবো না কারণ তার আর প্রয়োজন নেই। তবে প্রথমেই আমি আপনাদের দায়িত্বের কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেবো। আজকের দিনে প্রত্যেক পূর্ব এশিয়াবাসী ভারতীয়ের কর্তব্য ভারতকে স্বাধীন করা এবং আমি আশা করি যে দায়িত্ব আপনাদের ওপর এসে পড়েছে তার গুরুত্ব আপনারা উপলব্ধি করতে পারছেন।

আপনাদের উপলব্ধি করতে হবে যে আজ পূর্ব এশিয়ার সমস্ত ভারতীয় মিলে এক বিরাট বাহিনীতে পরিণত হয়েছেন যাঁদের সংগ্রাম করতে হবে এবং সংগ্রামে জয়লাভ করতে হবে। আপনাদের মধ্যে যতরকম প্রভেদ থাকুক না কেন, শুধু এই কথাটা মনে রাখতে অনুরোধ করি যে কর্তব্যের খাতিরে আপনারা সকলেই সমান। আমি চাই পূর্ব এশিয়ার প্রত্যেক ভারতীয় তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করুন।

যখন কোন স্বাধীন দেশে এইরকম বিপর্যয় স্বরু হয়--বিদেশীরা এসে দেশ আক্রমণ করে তখন ভিক্ষা করে নয়……অনুরোধ করে নয়……সমস্ত সক্ষম দেশবাসীকে সর্বস্ব পণ করে সমর সজ্জায় সজ্জিত করতে বাধ্য করা হয়। যদি আমাদের ভারতবর্ষ স্বাধীন হত, যদি সেখানে বৈদেশিক আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিত তাহলে সেই স্বাধীন ভারতে কি পূর্ণ সমরসজ্জা বা total mobilisation স্বরু হয়ে যেতো না? অবশ্য ভারতবর্ষ এখনও পর্যন্ত স্বাধীন হতে পারে নি কিন্তু মনে প্রাণে আমরা স্বাধীন। এই সাময়িক আজাদ-হিন্দ-সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্বাধীন জাতিতে পরিণত হয়েছি।

এখন আমাদের কর্তব্য ভারতবর্ষকে প্রকৃত স্বাধীন করে সেখানে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করা। আমরা যদি স্বাধীন হবার আকাঙ্খা পোষণ করি তাহলে স্বাধীন ভারতে মানুষ হিসাবে আমরা যা করতাম, সেইমতই আজকে কাজ করে যেতে হবে।

ন্যায্যতঃ বলতে গেলে যে দেশে যুদ্ধ সুরু হয় সে দেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তি কিছু থাকে না। যদি আপনারা আপনাদের বিষয় সম্পত্তি আপনাদের নিজস্ব বলে মনে করেন তাহলে আপনারা একটা ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে পড়ে আছেন বলতে হবে। যখন কোন দেশ যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়ে তখন প্রত্যেকটি প্রাণ, প্রত্যেকটি সম্পত্তি দেশের অধিকারভুক্ত হয়ে পড়ে! আপনার জীবন আপনার সম্পত্তি আজ থেকে আর আপনার নয়, সমস্তই ভারতবর্ষের—একমাত্র ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যেই উৎসর্গীকৃত।

যদি এই সাধারণ সত্যটুকু উপলব্ধি করতে না পারেন, তাহলে আর একটি খোলা রাস্তা আপনার সামনে পড়ে আছে। যদি আপনি স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ বলে নিজেকে বোধ না করেন, যদি তার দায়িত্ব না বহন করতে চান, যদি আপনি স্বাধীনতা না চান, এবং যদি আপনি স্বাধীনতার মূল্য দিতে ইচ্ছুক না হন, তাহলে আপনার আর একটি মাত্র পথ খোলা আছে। কিন্তু মনে রাখবেন যে যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে তখন সেই ভারতবর্ষে আপনার কোন স্থান থাকবে না। আর যদি ভারতের স্বাধীন সরকার আপনার দুঃখে ব্যথিত হয়, তাহলে সবচেয়ে বেশী দাক্ষিণ্য যা আপনাকে দেখাতে পারা যায় তা হবে বিলেতে যাবার একখানা তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট দিয়ে আপনাকে পবিত্র ভারতভূমি থেকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া।

যে কোন মূল্য দিয়েই হোক আর যে কোন উপায়েই হোক ভারতবর্ষকে আমায় স্বাধীন করতেই হবে এবং আপনাদের এতে পছন্দ না হলেও আপনাদের কর্তব্য সেই গুরু দায়িত্বে নিজের নিজের অংশ গ্রহণ করা। আপনারা যদি এড়িয়ে যেতে চান তাহলে স্পষ্ট বলুন আপনারা স্বাধীনতা চান না, তার জন্য আমি আগেই বলেছি অন্য পথ খোলা আছে।

আমি কথা দিচ্ছি বন্ধুগণ, যে আমি সে জাতের লোক নই যারা বড় বড় কথা আর ফাঁকা হুমকী দিয়ে বেড়ায়! আমি যা বলি তা পূর্ণ বিবেচনার পর

বলি এবং যা বলি তার একটা অর্থ আছে। আমার শত্রুরাও জানে যে কথার অর্থ নাই সে কথা আমি কখনও বলি না। আমি বলেছি যে, যে কোন উপায়েই হোক আর যে কোন মূল্য দিয়েই হোক স্বাধীনতা আমাদের অজন করতেই হবে এবং সম্ভব হলে স্বেচ্ছায় এবং আবশ্যক হলে জোর করে পূর্ণ সমরসজ্জা বা total mobilisation আমাদের করতেই হবে।

আমি দেখে অবাক হচ্ছি যে অনেকে তাঁদের অর্থ দান করতে গিয়ে দ্বিধাবোধ করছেন, তাঁরা বলছেন এ নাকি তাদের সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ তাছাড়া তাঁদেব সন্তান-সন্ততি আছে। কিন্তু, যখন আজাদ-হিন্দফৌজ জয়যাত্রার পথে অগ্রসব হতে শেষ বিন্দু রক্ত পর্যন্ত ত্যাগ করতে শিক্ষা পাচ্ছে তখন ধনী সম্প্রদায় প্রশ্ন তুলেছেন total mobilisation অর্থে শতকরা ১০ না শতকরা ৫ ? যাঁরা এই শতকরার প্রশ্ন তুলছেন তাঁদের আমি বলছি যে আমরা কি সৈন্যদের শতকরা ১০ ভাগ রক্ত ত্যাগ করতে এবং বাকীটুকু রক্ষা করতে আদেশ দিতে পারি ?

একদিকে যেমন তরুণের দল প্রাণ দেবার জন্যে এগিয়ে আসছে অন্যদিকে তেমনি দবিদ্রের দল তাদের সমস্ত সম্বল নিঃশেষে দান করবার জন্যে স্বেচ্ছায় ও উৎসাহের সঙ্গে ছুটে আসছে। ভারতের দরিদ্রতর শ্রেণীর লোক যেমন চৌকিদার, ধোপা, নাপিত, দোকানদার এবং গয়লার দল তাদের সর্বস্ব দিতে এগিয়ে আসছে। এদের মধ্যে অনেকে তাদের পকেটে যা ছিল সব দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি তারা তাদের জীবনের সমস্ত সঞ্চয় তাদের সেভিংস ব্যাঙ্কের খাতাগুলো পর্যন্ত নিয়ে এসেছে।

আটত্রিশকোটি মানুষকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করার চেয়ে আরও বৃহত্তর, মহত্তর এবং পবিত্রতর উদ্দেশ্য কি থাকতে পারে ?······

এই মর্মস্পর্শী আহ্বানের প্রত্যুত্তর পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়েরা দিয়েছিল ইম্ফলের যুদ্ধক্ষেত্রে কামানের গর্জন দিয়ে !

আজাদ-হিন্দ-ফৌজের কয়েকজন বীর সৈনিকের নাম ঃ—

ক্যাপ্টেন শাহ্‌ নওয়াজ খান, ক্যাপ্টেন জি, এস, ধীলন, ক্যাপ্টেন পি, কে, সায়গল, লেঃ কঃ এ, ডি, লোকনাথন, মেজর আজিজ আহম্মদ, ক্যাপ্টেন এসান কাদের, ক্যাপ্টেন এস, এম, হাসেন, ক্যাপ্টেন বুরহানুদ্দীন, লেঃ মাকরানা, ক্যাপ্টেন মহবুব আহম্মদ, ক্যাপ্টেন কাজী মহম্মদ গ্রীম, ক্যাপ্টেন এ, ডি, জাহাঙ্গীর, ফ্লাইট লেঃ এম, এম, লতিফ, ক্যাপ্টেন আর, এন, আরসাদ। ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন, রেবা সেন, সিপ্রা সেন, মায়া গাঙ্গুলী ও রাণু ভট্টাচার্য।

হে ভারত, হে মুক্তিকামী ঘুমন্ত সিংহ্‌ এঁদের নাম মনের খাতায় স্মৃতির স্বর্ণজলে অক্ষয় করে রেখো।

৮ই আগষ্ট ১৯৪৫ সালে সিঙ্গাপুরে নেতাজী শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন। তার ওপর লেখা ছিল—একতা—বিশ্বাস—বলিদান। সিঙ্গাপুর পুনর্দখলের পর ৭ই সেপ্টেম্বর বৃটিশ সৈন্য এই স্মৃতিস্তম্ভ ধ্বংস করে দেয়। নেতাজী প্রতিষ্ঠিত 'আজাদ-হিন্দ' পত্রিকাও আজ লুপ্ত হয়ে গেছে।

ঝড়ের পর

একথা স্বীকার করতে হবে আজাদ-হিন্দ-ফৌজ চূড়ান্ত জয়লাভে সক্ষম হয় নি। শেষ পর্যন্ত অধিকতর শক্তিশালী মিত্রশক্তি তার সাম্রাজ্যবাদের উন্মত্ত প্রচেষ্টায় সিদ্ধিলাভ করেছে। কিন্তু 'একতা—বিশ্বাস—ও—বলিদানের' ব্রত নিয়ে 'কদম কদম বাড়ায়ে যার' মন্ত্র উচ্চারণ করে 'জয় হিন্দের' প্রচণ্ড নিনাদে যে জয়যাত্রা স্থরু করেছিল ভারতের মুক্তি ফৌজ নেতাজীর অবিচলিত নেতৃত্বে আস্থা রেখে—সে জয় যাত্রার প্রথম পদক্ষেপ রক্তের পঙ্কিল কর্দমে আজও অঙ্কিত হয়ে আছে মণিপুরের পরিত্যক্ত রণক্ষেত্রে—সে জয়যাত্রার দ্বিতীয় পদক্ষেপ কোলকাতার রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে নিরস্ত্র ছাত্রদের ওপর নির্মম গুলী চালনায় নিঃসৃত রক্তস্রোতে—তারপর পর পর চট্টগ্রাম ও বোম্বাই সহরের তাণ্ডবলীলা!···

আমরা আগেই দেখেছি ১৯৪৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আজাদী-ফৌজের সঙ্গে বৃটিশ বাহিনীর যুদ্ধ সুরু হয়। তারপর ক্রমান্বয়ে এক বছর ধরে ভীষণ সংগ্রাম চলে এবং আজাদী ফৌজ শাহ্ নওয়াজের অধিনায়কত্বে মণিপুরের কিয়দংশ দখল করে সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে সমর্থ হয়। তারপর ভাগ্য বিপর্যয় সুরু হয় এবং কিছু দিন পর এ্যাটম বোমার বা আনবিক বোমার অমানুষিক ধ্বংস লীলায় বিধ্বস্ত হয়ে জাপানীরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু জাপানীরা আত্মসমর্পণ করলেও আজাদী ফৌজ বীর বিক্রমে কিছুদিন পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যায়। এর পর ২৩শে আগষ্ট ১৯৪৫ সালে হঠাৎ জাপান থেকে ঘোষণা করা হয় যে আজাদ-হিন্দ-সরকারের সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এক বিমান দুর্ঘটনায় আহত হয়ে জাপানী হাসপাতালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। শ্রীযুক্ত বসু জাপানী সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবার জন্যে ১৮ই আগষ্ট সিঙ্গাপুর থেকে টোকিও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তাইহকু বিমান ক্ষেত্রে বেলা ২টার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে এবং তিনি সাংঘাতিকভাবে আহত হন। জাপানের এক হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় এবং সেখানেই মধ্যরাত্রে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এই সংবাদে জগতব্যাপী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ইতিপূর্বে কয়েকবার সুভাষবাবুর মৃত্যু সম্পর্কে মিথ্যা খবর রটনার ফলে এবারও লোকে, বিশেষ করে ভারতের জনসাধারণ সংবাদটি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করে। যদিও বৃটিশ সরকার ও জাপানী সরকার নানাভাবে প্রমাণ পত্র দাখিল করে এবং নানাবিধ প্রচার কার্যের সাহায্যে সংবাদটি সমর্থন করবার চেষ্টা করছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত দেশবাসীর এবং

দেশের সর্বদলীয় নেতাদের বিশ্বাস যে নেতাজী এখনও জীবিত অবস্থায় অন্য কোন দেশে আরও বৃহত্তর কিছু পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। বিংশ শতাব্দীর মানুষ দেবতা মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত বলেছেন, আমি বিশ্বাস করি সুভাষ এখনও বেঁচে আছে। সে এখন লুকিয়ে আছে, সময় হলেই ঠিক বেরিয়ে আসবে। ভগবানের আশীর্বাদে এই বিশ্বাস সত্য হোক আমাদের এইমাত্র কামনা।

সুভাষবাবুর এই কর্মবহুল চাঞ্চল্যকর প্রবাস জীবনের মধ্যে তাঁর পরিবারে দুটি দুর্ঘটনা ঘটে। প্রথমটি হল তাঁর অন্তর্ধানের একবছরের মধ্যেই সারদার মৃত্যু। এই সারদার সেবাযত্নের মধ্যেই সুভাষচন্দ্র আবাল্য পালিত। তিনি সারদাকে মায়ের মত ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন। দ্বিতীয় দুর্ঘটনা সুভাষচন্দ্রের জননী রত্নগর্ভা প্রভাবতী দেবীর পরলোক গমন। ১৯৪৩ সালের ২৮ই ডিসেম্বর কোলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়।' মৃত্যুর কয়েকদিন আগে পর্যন্ত প্রবাসী সন্তানের জন্য আশীর্বাদের ও কল্যাণ কামনার নীরব অভিব্যক্তিতে তাঁর মুখ এক অপূর্ব দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে থাকতে আমরা দেখেছি। স্বর্গ থেকে তিনি আজ তাঁর স্নেহের সুভাষের দিগ্বীজয়ী অভিযান দেখছেন।

আমাদের মত নগণ্য লোকের তাঁর মত বিরাট ব্যক্তিত্বের সমালোচনা করতে যাওয়া অন্যায়,—শুধু অন্যায় কেন বাতুলতা। তবু, নিছক ইতিহাসের খাতিরে আমাদের কিছু বলতে হবে। আজাদ-হিন্দ-ফৌজের ইতিহাস পড়ে প্রত্যক্ষ জয়লাভের ইঙ্গিত আমরা পাই না বটে কিন্তু পরোক্ষভাবে সুভাষচন্দ্র কি ভাবে জয়ী হয়েছেন সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট ধারণা হয়।

বরাবরই সুভাষচন্দ্র বিপ্লবপন্থী। গান্ধীবাদের অমোঘ প্রভাব যখন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে বাস্তবিকপক্ষে তখনই রাজনীতিক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের উদয়। সুভাষচন্দ্র মনেপ্রাণে গান্ধীজীকে শ্রদ্ধা করেন এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ জননায়ক হিসাবে মেনে নিয়ে চলেন। এমন কি সুদূর ব্রহ্মদেশে যেখানে তাঁর নিজ হাতে গড়া

স্বাধীন ভারতে তিনিই একমাত্র নেতা সেখানেও প্রতি পদে তিনি গান্ধীজীকে স্মরণ করে নিয়েছেন। আজাদী সেনাদের ওপর তার নির্দেশ ছিল যে যদি শেষ পর্যন্ত পরাজয় ঘটে তাহলে গান্ধীজীর চরণতলেই তাদের শরণ নিতে হবে গান্ধীজীকে শ্রদ্ধা করলেও তিনি বুঝেছিলেন আধুনিকযুগে গান্ধীবাদ অচল তার নিজস্ব পথ—বিপ্লবের পথকে সফল করবার জন্যেই গান্ধীজীর সঙ্গে তার যত কিছু সংঘাত এবং আজাদ-হিন্দ-ফৌজ গঠন করে তিনি দেখিয়ে দিয়ে গেছেন বিপ্লবের ভেতর দিয়ে, সামরিক শৃঙ্খলার ভেতর দিয়ে দেশকে কতখানি আগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়! কংগ্রেস ৬০ বছরের চেষ্টায় যা পারে নি তিন বছরের মধ্যে সুভাষচন্দ্র তা করে গেলেন। আজকের দিনে কংগ্রেসেরএ ই বিপুল জনপ্রিয়তা-- এই বিপুল জনসমাবেশ— নেতাদের দর্শনের জন্য এই ব্যাকুল আগ্রহ এর মূলে আছে একটি ম্যাজিক শব্দ—জয় হিন্দ। কংগ্রেস এ কথা স্বীকার করে নিয়েছে।

তাই বলি, দক্ষিণপন্থী দল তোমাদের ঋণ পরিশোধের দিন কি এসেছে!

আজাদ-হিন্দ-ফৌজের দ্বিতীয় ফল হিন্দু-মুসলমান ঐক্য। যে ঐক্যের অভাবে আজ আমাদের এত গৃহবিবাদ এত শক্তিক্ষয় হয়ে যাচ্ছে যে ঐক্য বৃটিশের কারসাজিতে কংগ্রেসের শত প্রচেষ্টার ফলেও সম্ভব হয় নি সেই ঐক্যের মূলভিত্তি স্থাপিত হয়ে গেছে মণিপুরের সকলজাতির সকল ধর্মের রক্ত-কর্দমে। সেই ভিত্তির ওপরই আমাদের ভ্রাতৃত্ববোধের বিরাট সৌধ গড়ে উঠবে, আত্মনিয়ন্ত্রণের ভণ্ডামীর ওপর নয়। মুশ্লিম লীগ তোমরা দয়াকরে শুধু এই কথাটি মনে রেখো যে আজাদ হিন্দ-ফৌজের বীরশ্রেষ্ঠ সৈনিক শাহ নওয়াজ খান তোমাদেরই জাত ভাই। মনে রেখো ভারতের এই সুসন্তানের বাণী, যে বাণী দিল্লীর কেল্লায় তোমরা যখন তাঁকে রক্ষা করতে গিয়েছিলে তিনি তোমাদের দিয়েছিলেন—'আমি যা করেছি তার সঙ্গে কোন জাতি, দল বা সম্প্রদায়ের প্রশ্ন জড়িত নেই। আমি যা করেছি তা আমার দেশমাতার জন্য করেছি কংগ্রেসই একমাত্র আমাকে সমর্থন করবার অধিকারী'।

তৃতীয় ফল, বিশ্বের দরবারে ভারতের স্বীয় মর্যাদা ও আসন লাভ। এই পরাধীন ভারতের মানুষ হয়ে, একটি মাত্র লোক পুলিশের বেষ্টনী পার হয়ে আটত্রিশ কোটি মানুষের সমুদ্র পার হয়ে, যুদ্ধরত বিদেশী রাজ্যে—শত্রুর সীমানায় পৌছে দু'বছরের মধ্যে অর্থ সংগ্রহ করে মানুষ সংগ্রহ করে, অস্ত্র সংগ্রহ করে এক বিরাট বাহিনী নিয়ে এসে রুখে দাড়ালো বিশ্বজয়ী এ্যাঙ্গলো আমেরিকানের বিরুদ্ধে, তাদের পদে পদে লাঞ্ছিত করে জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দিলে বেয়নেটের আগায় শাসিত পরাধীন দেশের মাটির ওপর—এক আলাদীনের প্রদীপের গল্প ছাড়া চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলে কেউ বিংশ শতাব্দীর যুগে বিশ্বাস করতে পারতো কি ?

নির্লজ্জ বৃটিশ হয়ত বলবে, কিন্তু হেরে ত গেছে !

আমরা বলি, মনে আছে ত, কবিগুরুর বাণী ?—ঘটে যাহা তাহা সত্য নহে !

ধাপ্পাবাজ বৃটিশ হয়ত বলবে, কিন্তু তোমরা ত জাপানীর চর !

নেতাজীর কণ্ঠে তার প্রত্যুত্তর আমরা শোনাবো—

আমি ত্রি-শক্তির সমর্থন করে কিছু বলছি না। ত্রি-শক্তির সমর্থন করে কিছু বলা আমার কাজ নয়। বৃটেনে ভাড়াটে প্রচারকগণ আমাকে শত্রুর চর বলে অভিহিত করছে। আমার সমগ্র জীবনই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অবিরাম ও আপোষহীন সংগ্রামের সুদীর্ঘ ইতিহাস। চির জীবন ধরেই আমি ভারতমাতার সেবক। আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি ভারতের সেবক থাকব এবং পৃথিবীর যে অংশেই আমি বাস করি না কেন, একমাত্র ভারতবর্ষের প্রতিই আমার আনুগত্য ও অনুরাগ আছে এবং চিরকাল থাকবে।

আমি বিশেষ যত্নের সঙ্গে দু'শ বছরের ইতিহাস পড়ে দেখেছি। বৈদেশিক শক্তির সাহায্য ব্যতীরেকে স্বাধীনতা লাভ হয়েছে এমন একটা দৃষ্টান্তও পাই নি। বৃটেন নিজে জগতের সব স্বাধীন রাজ্যের সাহায্যই চাইছে না, সে ভারতবর্ষের মত পরাধীন দেশগুলোর সাহায্যও চাইছে। বৃটেনের পক্ষে সাহায্য গ্রহণ করা যদি

দোষ না হয়ে থাকে তাহলে শৃঙ্খলিত ভারতবাসীর পক্ষে যে সাহায্য একান্ত প্রয়োজন সেই সাহায্য গ্রহণ করলে ভারতবর্ষেরও কোন দোষ হতে পারে না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামে কোন সাহায্য পেলে আমরা ভারতবর্ষে তা বরণ করে নেবো।

যুগে যুগে সূর্য ওঠে আকাশের পূর্ব দিগন্তে—সূর্য-ওঠে ভারতের পূর্ব সীমান্তে এবারের সূর্য উঠলো আরও পূর্বে---পূর্ব-এশিয়ার বিস্তীর্ণ রণ-ক্ষেত্রে!

আগামী দিনের স্বাধীন ভারতের সেই সোনার সূর্যের আলোর পরশ পেয়েছ বন্ধু? সে আলোর অগ্নিতে শুদ্ধ করে নিয়েছো তোমার আত্মা?

যদি না দেখে থাকো ত আমার সঙ্গে এসো, পাহাড়ের উচ্চ শিখর থেকে সে সূর্যকে দেখবে চল।

একটা আধটা পাহাড় নয়—অনেকগুলো পাহাড় পেরোতে হবে শিখরে উঠতে গেলে—দেড় শ' বছরের অন্ধকার আর আত্মগ্লানির পাহাড়···তারপর শুধু ১৯৪২'এর নয় বহু আগষ্টের বহু কঙ্কালের স্তূপ···হ্যাঁ নদীস্রোতও আছে···কত জালিয়ানওয়ালাবাগের উন্মত্ত রক্তস্রোত···! এসব পেরিয়ে ঐ যে শিখর ওর ওপর থেকে দেখতে হবে প্রথম সূর্যোদয়···! ওকি? শিউরে উঠলে কেন বন্ধু আতঙ্কে?···ও ত' ঝড় নয়—ওযে বহু অশান্ত আত্মার উত্তপ্ত নিঃশ্বাস···চল আমরা পেরিয়ে যাই।···

এই ত' আমরা এসে গেছি···। দেখতে পাচ্ছো বন্ধু? দেখতে পাচ্ছো বহু দিনের নির্যাতন আর বেদনার উত্তপ্ত গোলোক ঐ উঠছে···। তার আলো তোমার গায়ে আমার গায়ে সমানভাবে এসে পড়ছে···। ওকি? রক্তের মধ্যে এ কিসের দোলা? কিসের তাপ?

তবে কি ঘুম ভাঙ্গার দিন এসে গেল? তোমার হাতিয়ারটায় শান দিয়ে রেখেছো ত বন্ধু?—কংগ্রেসের দেওয়া অহিংসার ক্ষুরধার হাতিয়ার?…

মনে আছে ত' তোমার আদর্শ—একতা—বিশ্বাস – বলিদান?

মনে আছে ত' তোমার মুক্তিমন্ত্র—জয়-হিন্দ?

তবে চল—সবাই যেদিকে চলেছে সেই দিক পানে কদম্ কদম্ পা বাড়ায়ে চল …

কিন্তু, বলতে পারো, দিল্লী আর কতদূর?

পরিশিষ্ট

(ক)

ইতিপূর্বেই আমরা আজাদ হিন্দ বাহিনীর কয়েকজন বীর ও বীরাঙ্গনার নাম জেনেছি। সর্বশেষে যাঁরা তাঁদের অমিত বিক্রম ও দেশপ্রেমের জন্য সমস্ত ভারতবাসীর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় হয়ে উঠেছেন তাঁদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নীচে দেওয়া হল—

শাহনওয়াজ : পাঞ্জাবের এক বিখ্যাত অভিজাত বংশে তাঁর জন্ম। সুদৃঢ় দেহ এবং প্রসারিত বক্ষ সত্যিই তাঁর এই সেনানায়কের পদের উপযুক্ত। আজাদ-হিন্দ সপ্তাহে কোলকাতার মিছিলে তাঁর সেই দৃপ্ত দেহভঙ্গী যে দেখেছে সেই শ্রদ্ধায় মাথা নীচু করে স্বাধীন ভারতের এই মহারথকে অন্তরের অভিনন্দন জানিয়েছে। শোনা যায় তাঁর বংশে কমপক্ষে ৬২ জন আত্মীয় ভারতীয় সেনা বাহিনীতে আছেন। ইম্ফলের যুদ্ধে তিনি বৃটিশ সেনার অন্তর্ভুক্ত তাঁরই এক ভায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর পরিচালনাধীনেই আজাদ-হিন্দ বাহিনীর এক দল সেনা মণিপুর থেকে ইংরাজ ও আমেরিকান সৈন্যদের বিতাড়িত করে প্রথম ভারতের বুকে প্রথম স্বাধীন ভারতীয় হিসাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করে দিল্লীর বুকের ওপর উত্তোলিত জাতীয় পতাকার নীচে কবে আবার তিনি এসে দাঁড়াবেন ভারতবাসী উৎকণ্ঠার সঙ্গে তারই দিন গুনছে।

গুরবকশ সিং ধীলন—১৯১১ সালে লাহোরের এক অভিজাত শিখ পরিবারে ধীলনের জন্ম। ধীলনের পিতার নাম সর্দার ঠাকুর সিং। সর্দার ঠাকুর সিং নিজে তাঁর আর দুই ছেলে এবং তাঁদের আরও অন্যান্য আত্মীয় ভারতীয় সেনা বাহিনীতে

নিযুক্ত ছিলেন বা আছেন। ধীলনের স্ত্রীর নাম বসন্ত কাউর। মণ্টগোমারী স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। সামরিক পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়ে তিনি উচ্চপদে উন্নীত হন। যুদ্ধ সুরু হওয়ার সময় তিনি পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের সঙ্গে মালয়ে ছিলেন। তারপর আরও উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি কিছুদিনের জন্য ভারতে আসেন এবং পরে উত্তর মালয়ের জঙ্গলে প্রেরিত হন। সেখানে জাপানের বিরুদ্ধে তিনি বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ চালান এবং তার জন্য বহু ভারতীয়ের প্রাণ রক্ষা হয়। পরে অবশ্য তিনি জাপানের হাতে বন্দী হন। তারপর ব্যাংককে অনুষ্ঠিত পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় নেতাদের সম্মেলনে অন্যান্য যুদ্ধ বন্দীদের সঙ্গে মোহন সিংয়ের নেতৃত্বাধীনে আজাদ-হিন্দ-ফৌজে যোগদান করেন।

পি, কে, সায়গল—১৯১৫ সালে সায়গলের জন্ম। তাঁর পিতার নাম স্যর অশ্রুরাম—তিনি লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি। দেরাদুন সামরিক শিক্ষালয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ভারতীয় সেনা বাহিনীর দশম বালুচ রেজিমেণ্টে যোগ দেন। সিঙ্গাপুরে বৃটিশের পরাজয়ের পর তিনি আজাদ-হিন্দ-ফৌজে যোগদান করেন। আজাদ-হিন্দ বাহিনীতে তিনি কর্ণেলের পদে ভূষিত হন এবং সামরিক সম্পাদকের পদ প্রাপ্ত হন। আজাদ-হিন্দ-বাহিনীর ইতিহাস বিখ্যাত বিচারের সময়ে তাঁর ভগিনীগণ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে তাঁর কপালে চন্দন তিলক অঙ্কিত করে দেন এবং তার ফলে বিচারালয়ে এক অদ্ভুত উত্তেজনা ও আনন্দ কোলাহলের সৃষ্টি হয়। সম্প্রতি জানা গিয়েছে যে তিনি নাকি শীঘ্রই তাঁর বাগদত্তা বধূকে বিবাহ করবেন।

রাসবিহারী বসু—অল্পখ্যাত মহা বিপ্লবী বীর রাসবিহারী বসুই প্রথম আজাদ-হিন্দ-বাহিনীর স্রষ্টা। ১৯১২ সালে রাজ প্রতিনিধি বড়লাট হার্ডিঞ্জের এক শোভাযাত্রায় বোমা নিক্ষেপের ফলে তিনি ঐ দলের নেতা হিসাবে পুলিশের নজরে পড়েন। তাছাড়া তিনি আরও কয়েকটি স্বদেশী ডাকাতির পরামর্শদাতা ও দলপতি হিসাবে অভিযুক্ত হন। তাঁর সঙ্গীদের অনেকেই ফাঁসি কাষ্ঠে জীবন দান করেন।

কিন্তু তাঁকে ধরবার জন্যে ১২ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত হলেও তিনি গুপ্ত জীবন যাপন করতে থাকেন এবং বিপ্লবীমূলক কার্য চালিয়ে যেতে থাকেন। পরে তিনি বৃটিশকে ফাঁকি দিয়ে ১৯১৫ সালে জাপানে গিয়ে হাজির হন। জাপানে গিয়ে চীন থেকে অস্ত্রশস্ত্রাদি ভারতে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন কিন্তু তাঁর এই গোপন অভিসন্ধি বৃটিশ কর্তৃপক্ষ জানতে পারে এবং বৃটিশের অনুরোধে জাপান কর্তৃপক্ষ তাঁকে পাঁচদিনের মধ্যে সাংহাই ত্যাগ করতে আদেশ দেন। পুনর্বার আট বৎসর কাল তিনি গুপ্ত জীবন যাপন করেন। তারপর স্থানীয় ভারতীয়দের নিয়ে তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ গঠন করেন এবং শেষে এই সঙ্ঘ নেতাজীর হস্তে সমর্পণ করেন। তিনি শেষ পর্যন্ত আজাদ-হিন্দ-সরকারের পরামর্শদাতারূপে যুক্ত ছিলেন। তিনি জাপানী ভাষায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বই লেখেন এবং ডাঃ স্যাণ্ডারল্যাণ্ডের India in Bondage বইখানির জাপানী তর্জমা করেন। তাছাড়া তিনি একখানি জাপানী পত্রিকার সম্পাদনা করতেন এবং জাপানের বহু সংবাদপত্রে লিখতেন।

সুভাষবাবুর মিথ্যা বিমান দুর্ঘটনা রটনার সঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছিল যে ঐ দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু সে কথা পরে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয় এবং প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৪ সালে যুদ্ধের মধ্যেই এই বীর পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

জগন্নাথ রাও ভোঁসলে—৩৯ বৎসর আগে শিবাজী স্মৃতি ধন্য মহারাষ্ট্রে তিরোদ গ্রামে এঁর জন্ম। ইনি দেরাদুনের প্রিন্স অব ওয়েলস সামরিক বিদ্যালয়ে সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে কোয়েটায় ল্যাঙ্কাশায়ার রেজিমেণ্টে যোগদান করেন। পরে তিনি রাজকীয় মারাঠা পদাতিক বাহিনীতে যোগ দেন। কুহুরে কয়েকজন বৃটিশ কর্মচারীকে সমুদ্র গর্ভ থেকে রক্ষা করে তিনি বিশেষ পদকলাভ করেন এবং তাঁকে ক্যাপ্টেন উপাধি দান করা হয়। তাঁর পূর্বপুরুষদের মত তিনি লণ্ডনে সম্রাটের অভিষেক উৎসবে যোগদান করেন। ভারতে ফিরে তিনি সাধারণ সামরিক শিক্ষক

হিসাবে নিযুক্ত হলেন। এই পদে তিনিই প্রথম ভারতীয়। পরে বেরিলী থেকে সিঙ্গাপুরে জেনারেল ষ্টাফের লেফটনেণ্ট জেনারেল রূপে তিনি স্থানান্তরিত হলেন। সিঙ্গাপুরের পতনের পর তিনি আজাদ-হিন্দ-ফৌজের সর্বাধিনায়করূপে নিযুক্ত হন। জগন্নাথ রাও নিজেও যেমন অভিজাত বংশের তেমনি তিনি বিবাহও করেছেন বরোদার রাজবংশের আত্মীয়া চন্দ্রিকা বাঈকে। তাঁর তিনটি কন্যা বর্তমান।

ডাঃ লক্ষ্মী স্বামীনাথন—ইনি মাদ্রাজের বিখ্যাত কংগ্রেস নেত্রী শ্রীমতী আম্মু স্বামীনাথনের কন্যা। এঁর বয়স বর্তমানে ৩২ বৎসর। ইনি মাদ্রাজ থেকে ১৯৩৭ সালে সিঙ্গাপুরে বেড়াতে এসে সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। তাঁর প্রথম স্বামী বৈমানিক বি, কে, নানমুন্দা রাওর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের পর তাঁর ডাক্তারী কলেজের পূর্বতন বন্ধু সিরিয়ান খৃষ্টান এব্রাহামকে বিবাহ করেন। সিঙ্গাপুরে থাকাকালীন তিনি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এবং আজাদ-হিন্দ-ফৌজ গঠনের পর তিনি মহিলা বিভাগ—রাণী ঝাঁসী বাহিনীর নেত্রীর পদে সম্মানিত হন। তাঁর অধীনে ১২০০ মহিলা রণক্ষেত্রে এবং হাসপাতালের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। জাপানীদের পতনের পর তিনি কালেওয়াতে আজাদী সৈন্যদের সেবা শুশ্রূষার ভার নিয়েছিলেন। তারপর তিনি বৃটিশের নিকট আত্মসমর্পণ করেন।

বেলা দত্ত—এঁর জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় নি। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে মাত্র ষোল বৎসর বয়সে তিনি যে বীরত্ব ও মানসিক বলের পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই ভারতীয় নারীর পক্ষে গৌরবের বিষয়। দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি অবিরাম বোমাবর্ষণের মধ্যেও তিনি অসমসাহস ও নিষ্ঠার সঙ্গে হাসপাতালের কাজ চালিয়ে গেছেন। একবার ৮৫ জন রোগীর সেবার ভার সম্পূর্ণ একা তাঁকে বহন করতে হয়েছিল।

শ্রীচন্দ্রপ্রকাশ—ইনি নেতাজীর জার্মানী থেকে জাপানে আসার পথে তাঁর সঙ্গে চালক হিসাবে ছিলেন। নেতাজী তাঁকে একটি হাতঘড়ি ও একটি স্থিতিস্থাপক

কোমর-বন্ধনী উপহার দেন। তিনি বলেন নেতাজী স্বয়ং সাধারণ সৈনিকের মত সৈনিকদের সঙ্গে সাজসজ্জা খাওয়া থাকা করতেন। সম্মুখ সমরে নিজে উপস্থিত থেকে সৈনিকদের উৎসাহ দিতেন। বোমাবর্ষণের সময় সৈনিকরা আশ্রয় না নেওয়া পর্যন্ত নিজে আশ্রয় গ্রহণ করতেন না। নেতাজী বিমানপথে বাংলা ও আসামের সহরের ওপরে দিয়ে উড়ে গেছেন। বোমাবর্ষণের তিক্ত অভিজ্ঞতার জন্য তিনি জাপানীদের ভারতবর্ষে নিরীহ জনসাধারণের ওপর বোমাবর্ষণ করার থেকে নিবৃত্ত রাখেন। তাছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রেও ভারতীয় সৈনিকদের (বৃটিশ বাহিনীর) যথাসম্ভব বাঁচিয়ে গুলি বর্ষণের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

বিক্রম সিং—উদয়পুর নিবাসী ভারতীয় জাতীয় সেনা বাহিনীর এই সৈনিক বলেন যে কোলকাতায় বোমাবর্ষণের পর একখানি চিত্র নেতাজীর হস্তগত হয়। ঐ চিত্রখানি কয়েক মিনিট স্তব্ধ দৃষ্টিতে দেখার পর নেতাজীর মন এতই বিচলিত হয়ে ওঠে যে তিনি জাপানীদের বাংলা ও আসামে অযথা বোমা নিক্ষেপ না করতে আদেশ দেন।

মেজর হাকিমজী—আজাদ হিন্দ সরকারের শ্যাম বেতার কেন্দ্রের প্রচারকর্তা এই ভদ্রলোক সম্প্রতি বলেছেন যে আজাদ হিন্দ সরকার বৃটিশের বন্ধু রাশিয়া ও চীন দেশের প্রতি নিরপেক্ষ মনোভাব পোষণ করতেন। এক সাংবাদিক সম্মেলনে নেতাজী বলেছিলেন যে, চীনের প্রতি তাঁর যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। কারণ ভারত ও চীনের উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উভয়েই পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে বিমুক্ত হবার সংগ্রামে লিপ্ত।

মিঃ হাসতান—ইনি ফ্রীস ইণ্ডিয়েন বা জার্মানীস্থ ভারতীয় সেনা বাহিনীর একজন অন্যতম বিশিষ্ট সামরিক কর্মচারী ছিলেন। ইনি নেতাজীর সঙ্গে জার্মানী থেকে জাপানে আগমন করেন। এই ফ্রীস ইণ্ডিয়েনের আরও কয়েকজন বীর সৈনিকের নাম—জামিল খান, আলী খান, ডাঃ ইশাক, ওরবাচান সিং, ডাঃ পটনেকাব ও গুরুমুখ সিং। এঁদের বাহিনীর সংখ্যা ছিল ৩৫০০—১৫টি দলে বিভক্ত।

খাওয়াজ আলী—এঁর দেশ রাওয়াল পিণ্ডি। তিনি জার্মানীতে আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে ছিলেন। ৮ই মে ১৯৪৫ পর্যন্ত তিনি জার্মানীতে ছিলেন এবং জার্মানীকে আত্মসমর্পণ করতে স্বচক্ষে দেখেছেন। আত্মসমর্পণের পর জার্মানীরা আজাদী ফৌজকে জার্মাণী পরিত্যাগ করতে আদেশ দেয় নতুবা মুগলের সৈন্যদের হাতে নিহত হবে বলে ভয় দেখায়। কিছুদিন আত্মরক্ষা করে থাকবার পরও তারা মুগলের সৈন্যদের কবলে পড়েন। তখন খাওয়াজ আলি মুগলকে জার্মানদের পরাজিত করার জন্য সম্বর্ধনা জানিয়ে এক পত্র লেখেন এবং সে পত্রে আরও জানান যে আসলে আজাদী ফৌজ বৃটিশেরই তথা মিত্র শক্তিরই অনুগামী, জার্মানদের অত্যাচারে অতীষ্ঠ হয়েই তাদের দলে যোগ দিয়েছে ইত্যাদি।…এই ধাপ্পার সাহায্যে তাঁরা মুক্তি পান।

আনন্দমোহন সহায়—আজাদ হিন্দ মন্ত্রিসভার সাধারণ সম্পাদক আনন্দমোহন সহায় ভাগলপুরে পুরানিসরাই গ্রামে এক দরিদ্র কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী লালমোহন সহায়। আনন্দমোহন দেশবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯২০ সালের স্বদেশী আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন এবং এক সময়ে রাজেন্দ্রপ্রসাদের প্রধান মুন্সীরূপে নিযুক্ত ছিলেন।

আনন্দমোহন আবাল্য দুঃসাহসী। এবং একবার গোপনে কোলকাতার এক সিন্ধী বণিকের সঙ্গে তিনি জাপানে পালিয়ে যান। পরে অবশ্য তাঁর ছোট ভাই সত্য দেও তাঁর সঙ্গে জাপানে গিয়ে যোগ দেন। যাই হোক এই জাপানে আসার ফলেই আনন্দমোহন বিপ্লবের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন। এই বিপ্লবের গুরু স্বনাম খ্যাত রাসবিহারী বসু। প্রকৃত পক্ষে এঁরা দুজনেই বিদেশে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। বলা বাহুল্য বৃটিশ গোয়েন্দা তাকে উত্যক্ত করে তোলে। তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই বক্তা লেখক ও সাংবাদিকরূপে বিশেষ পরিচিত হয়ে ওঠেন। ১৯২৮ সালে আনন্দমোহন কোলকাতায় এসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভগ্নী উর্মিলা দেবীর সপত্নী-কন্যা শ্রীমতী

সতী দেবীকে বিবাহ করেন। এবং পরে জাপানে ফিরে গিয়ে দুজনেই বিপ্লবে আত্মনিয়োগ করেন। ফলে বৃটিশ পুলিশ তাঁর ভারতস্থ পরিবারবর্গের ওপর অকথ্য নির্যাতন সুরু করে। বৃদ্ধ পিতাও এই লাঞ্ছনার হাত থেকে অব্যাহতি পান নি। জাপানে আনন্দমোহনের তিন কন্যা ও এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ১৯৪২ সালে নেতাজীর আগমনের পর আনন্দমোহন ও সতীদেবী দুজনেই নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেন ও বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে জাপানের আত্মসমর্পণের পর হ্যানয় সহরে একজন বৃটিশ অফিসারের কারসাজির ফলে তিনি এবং কর্ণেল চ্যাটার্জী গ্রেপ্তার হন।

কর্ণেল এ, সি, চ্যাটার্জি—আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করার আগে অর্থাৎ ভারতবর্ষে থাকাকালীন তিনি বাঙ্গলাদেশে জনস্বাস্থ্যের পরিচালক বা Director of Public Health ছিলেন। এখানেই তিনি রাজনৈতিক জীবনে যুক্ত ছিলেন ব্রহ্মদেশে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করে তিনি খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। এমন কি জনপ্রিয়তার দিক থেকে একমাত্র নেতাজীর পরেই ছিল তাঁর স্থান। কথা ছিল স্বাধীন ভারতে বাঙ্গলা দেশের গভর্ণর হবেন তিনি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের অধীনে শৃঙ্খলিত অবস্থায় তিনি ভারতে আনীত হয়েছেন। তাঁর প্রতি কঠিন ব্যবহার করার জন্য একটি সরকারী আদেশপত্র শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু সম্প্রতি ফাঁস করে দিয়েছেন।

মিঃ ইকবাল সৈইদী, মিঃ নিরঞ্জন সিং ও অজিত সিং :—১৯৪২ সালের জুন মাসে লিবিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে স্বনামখ্যাত মার্শাল রোমেল ২৫ হাজার মিত্রসৈন্যকে বন্দী করলেন তখন তাদের মধ্যে অনেক ভারতীয় সৈন্য ছিলেন। তাঁদের বেনগাজীতে স্থানান্তরিত করা হয়। তাঁদের মধ্য থেকেই জন্ম নেয় এক আজাদ হিন্দ বাহিনী এবং এঁদের সংগঠনের ভার নেন ইকবাল সৈইদী ও নিরঞ্জন সিং। তাঁদের চেষ্টায় প্রায় দুই হাজার ভারতীয় সৈন্য এই বাহিনীতে যোগ দেন। তাঁদের এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে একমাত্র ভারতের স্বাধীনতার

জন্যই ভারত সীমান্তে তাঁরা যুদ্ধ করবেন—লিবিয়াতে বা অন্যত্র নয়। তারপর ইটালীতে আবেজানো সৈন্যবাসে তাঁদের স্থানান্তরিত করা হল। ওদিকে সৈইদী ও বাবা অজিত সিংএর চেষ্টায় মাত্র ১০০ জন সৈন্যকে কেন্দ্র করে গঠিত আর একটি আজাদী সৈন্য বাহিনী এসে মিলিত হল তাঁদের সঙ্গে।

১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম দলটিকে রোমে পাঠানো হল সামরিক শিক্ষার জন্য। সেখানে তাঁদের কিছু কিছু সামরিক শিক্ষাও দেওয়া হয়েছিল এবং কয়েকজনকে প্যারাসুট বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছিল। এরই মধ্যে একদিন একজন ইটালীয় মেজর হুকুম দিলেন যে তাঁদের অনতিবিলম্বে লিবিয়াতে যুদ্ধ করবার জন্য তৈরী থাকতে হবে। আজাদী ফৌজের কার্যকরী সমিতির এক অধিবেশনে স্থির করা হল যে আজাদী সৈন্যরা একমাত্র আজাদী নেতাদের নির্দেশই মেনে চলবে। ফলে ইটালীর মন্ত্রিসভা এই আজাদী ফৌজ ভেঙ্গে দিয়ে তাঁদের সকলকে যুদ্ধবন্দী হিসাবে আটক করলেন।

শ্রীউত্তমচাঁদ—১৯৪১ সালের ১৫ই জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র মৌলবীর বেশে নিজ বাসস্থান ত্যাগ করে বরাবর পেশোয়ারে এসে হাজির হন। সেখান থেকে এক দরিদ্র পাঠানের বেশে তিনি কাবুলের ব্যবসায়ী শ্রীউত্তমচাঁদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। এইজন্যে ব্রিটিশ সরকারের অনুরোধে আফগান সরকার উত্তমচাঁদকে আফগানিস্থান থেকে বহিষ্কৃত করে দেন। আফগান পুলিশ তাঁকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় জালালাবাদে নিয়ে এসে এক অন্ধকার কুঠুরীতে দুদিন আবদ্ধ করে রাখে। তারপর ১৯৪২ সালের ১লা জুন আফগান থেকেও তাকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হয়, ফলে ব্রিটিশ পুলিশ পেশোয়ারে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ১৯৪৩ সালে রাওলপিণ্ডিতে তাঁকে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়। এই বন্দীদশায় তিনি নেতাজীর পলায়নকাহিনীর এক রোমাঞ্চকর ইতিহাস রচনা করেন। সেই ইতিহাস বর্তমানে প্রকাশিত হয়েছে। কারারুদ্ধ করে রাখা,

শারীরিক ক্লেশ দেওয়া ছাড়াও ভারত সরকার তাঁকে জানিয়েছেন যে তাঁর প্রায় লাখ টাকার সম্পত্তি আফগান সরকার মাত্র ১২০০০ টাকায় নীলাম করে নিয়েছেন। তাছাড়া তাঁর বহু পণ্য বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়েছে। এমন কি তাঁর ব্যবসার খাতাপত্রও তাঁকে দেওয়া হয়নি। সেই সব খাতাপত্রে বহু পাওনার হিসাব আছে। নীলামের টাকাও এখন তাঁর হাতে পৌছায় নি। সমস্ত সুখসম্পদের বিনিময়ে এই নির্ভীক দেশপ্রেমিক তাঁর কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করতে এতটুকুও দ্বিধা করেন নি। তিনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র।

পরিশিষ্ট

(খ)

সম্প্রতি 'জয়-হিন্দ' নামে একখানি রোজনামচা প্রকাশিত হয়েছে। এটি কার লেখা আমাদের জানা নেই তবে লেখিকা শ্রীমতি 'ম' নামে নিজের পরিচয় দিয়েছেন এবং এই রোজনামচাখানি 'জনৈক বিদ্রোহিনী ভারত কন্যার রোজনামচা' বলে প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। তার থেকে কিছু কিছু অংশ তুলে দেওয়া হল ঃ—

জুলাই ২, ১৯৪৩

সুভাষবাবু আজ এলেন। স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ সকলেই তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে ছুটলো। ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সে এক শ্বাসরোধী দৃশ্য—মানুষের সমুদ্র—ভারতীয় মালয়বাসী চীনা ও জাপানী—সকলেই এই বিরাট বিপ্লবীকে একবার দর্শন করবার জন্যে হুড়োহুড়ি করতে করতে পিষে গেল।

উন্নত, দৃঢ় ভঙ্গী, গৌরবে সমুন্নত ও অনমনীয় শির এবং তাঁর প্রাণভোলানো হাসি নিয়ে সুভাষ বাবু সকলের অন্তর জয় করে নিলেন। আমাদের বিশ্বাস হল যে সেই নেতা এলেন যাঁর ওপর আমরা নির্ভর করতে পারি এবং যিনি আমাদের গন্তব্যস্থলে নিয়ে যাবেন! ছবিতে তাঁর সুন্দর দেহগঠন ও পুরুষোচিত

দীর্ঘাকৃতির সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না। আমাদের চান্সারীগলির কার্যালয়ে স্থানীয় কর্মীদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের সময়ে আমি তাঁকে ভাল করে দেখলাম। তাঁর হাসির এমন এক যাদু আছে যার বিরুদ্ধে কোন রকম বিরোধিতা টিঁকতে পারে না।···

জুলাই ৯, ১৯৪৩

আজ এক বিরাট জনসমাগম। লক্ষ লক্ষ লোক নেতাজীর বক্তৃতা শুনতে জড় হয়েছে—প্রকৃতই শুধু মাথার সমুদ্র। দুরন্ত উত্তেজনা! সত্যিই নেতাজী যেভাবে জনসাধারণের সঙ্গে ব্যবহাব করেন তার মধ্যে এক অপূর্ব স্নেহের স্বাদ আছে। বিশেষ করে স্ত্রীলোকও শিশুদের প্রতি তিনি বিশেষ যত্নশীল। এমন কি তাঁকে দেখবার জন্যে কিংবা স্পর্শ করবার জন্যে যখন জনতা হুড়োহুড়ি করতে লেগে যায় তখনও তিনি একটুও রূঢ় ব্যবহার করেন না। গতকাল তিনি আমাদের কার্যালয় পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। একটি বৃদ্ধা মহিলা দরজার কাছে তাঁর পদস্পর্শ করতে চেষ্টা করেন। তিনি তাঁকে হাতে ধরে তুলে মাথা পেতে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। বল্লেন—'মা'! পরবর্তীকালে তিনি যখন কোলকাতায় ফেলে আসা স্নেহশীলা মায়ের কথা বর্ণনা করেছিলেন তখন আমাদের চোখে জল এসে গিয়েছিল।

মাইকের সামনে যখন তিনি বক্তৃতা করেন তখন নেতাজী ঋজু দৃঢ ভঙ্গীতে দাঁড়ান। তাঁর কোনরকম অস্বাভাবিক বক্তাসুলভ বাচলতা নেই। খুব কমই অঙ্গভঙ্গী করেন। গম্ভীর, ধীর অথচ দৃঢ় ভাষায় তিনি শুধু যুক্তির পর যুক্তি দিয়ে চলেন। শ্রোতাদের মধ্যে প্রত্যেক স্ত্রী ও পুরুষ মনে করে যেন বিশেষ করে তাকেই কথাগুলো বলছেন। কোনওরকম নাটুকে ভঙ্গী তাঁর মধ্যে নেই। এক চুমুকও জল খেতে হয়না কাউকে হাওয়া করতে হয় না···কোন লেখা থেকে স্মৃতি সঞ্চয় করতে হয় না · কোনও রকম কাগজপত্রের বালাই নেই। মনে হবে তোমার বাবা বুঝি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে তোমার মঙ্গলের জন্যে আবেদন করছেন জোরের সঙ্গে যুক্তি দিয়ে তোমাকে আচ্ছন্ন করছেন···।

জুলাই ২৫, ১৯৪৩

আজ শ্রীমতী ট—ও কুমারী স-কে চায়ের নেমন্তন্ন করেছি। কুমারী স পেনাং থেকে আসছেন—এবং সমস্ত এশিয়াবাসিদের আক্রমণকারী জাপানীদের হাতে ফেলে রেখে বৃটিশেরা কেমনভাবে পেনাং ছেড়ে পালিয়ে গেছে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে তার বর্ণনা দিচ্ছিলেন।

তিনি বললেন:

বোমাবর্ষণের ফলে কি বিরাট গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছিল তার বর্ণনা আমি দিতে পারবো না। .

তবে সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার এই যে এই জনসাধারণকে কোনও রকম সাহায্য করবার জন্য কোনও সরকারী কর্মচারী ছিল না। বৃটিশেরা সমস্ত খাদ্যদ্রব্য নিয়ে বন্দুকের পাহারায় এক কোনে সরে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করছিল। তৃতীয় দিনে ইভাকুয়েশন করা স্থির হল। কিন্তু কোন এশিয়াবাসীকে পালানোর ক্ষমতা দেওয়া হল না। স্থানীয় সামরিক ও অসামরিক কর্মচারীরা বল্লেন কেবলমাত্র খাটি বৃটিশ রক্তের লোকেরাই পালাতে পারবে। এমন কি ইউরেশিয়ানরাও নয়। আমি কয়েকজন ইউরেশিয়ান মহিলাকে জানি তারা বৃটিশ ব্যবসায়ীদের বিবাহ করেছিলেন। শ্রীমতী 'ব' আমার বন্ধু। তাঁর স্বামী তাকে ফেলেই পালালেন। তিনি ইউরেশিয়ান—তার যাবার অধিকার নাই।

জানুয়ারী ২৬, ১৯৪৪

আজ আমরা স্বাধীনতাদিবস পালন করলাম।

বক্তৃতার আগে নেতাজীকে মাল্যভুষিত করা হল। বক্তৃতার সময় তিনি মালাটি হাতে জড়িয়ে রেখে ছিলেন। বক্তৃতা শেষে জিজ্ঞাসা করলেন—এই মালাটি কেউ কিনতে চায় কি না। বিক্রয় লব্ধ টাকা ফৌজের তহবিলে যাবে।

প্রথম ডাক উঠলো এক লক্ষ টাকা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সংখ্যা যখন সওয়া চারে উঠলো, প্রথম গ্রাহক চীৎকার করে উঠলেন—পাঁচ। যখন শেষ ডাক সাত লাখ ঘোষণা করা হচ্ছে তখন তাঁকে একটু চিন্তিত দেখা গেল, মনে হল, অন্তরে কিসের একটা ঝড় উঠেছে। মালাটি বিক্রী হল বলে—এমন সময় তিনি মঞ্চের ওপর লাফিয়ে উঠলেন—আমি আমার সব দিচ্ছি—আমার যা কিছু—আমার পাই পয়সাটি পর্যন্ত—চীৎকার করে উঠলেন তিনি। সুভাষবাবু এই কম্পমান যুবকটিকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললেন—সাবাস্ —এ মালা তোমার!

মার্চ ২, ১৯৪৪

হুররে! আমাদের ডাক পড়েছে! হুকুম পাওয়া গেছে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে রাণী ঝাঁসি বাহিনী থেকে দুটি দলকে পাঠাবার অনুমতি পাওয়া গেছে। আমাদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে সম্মুখক্ষেত্রের অবস্থা বিপজ্জনক!

আমি যাচ্ছি 'প'—(শ্রীমতী ম'র স্বামী)। যদি ফিরে না আসি তাহলে আমার জন্য দুঃখ করো না। তুমি আবার বিবাহ করলে আমি খুশি হবো—কেবল একটি অনুরোধঃ প্রকৃত কর্মী বা রাণী ঝাঁসী বাহিনীর মধ্য থেকে কাউকে পছন্দ করে নিও। তোমার বর্তমান জীবনের পর প্রসাধনরতা, ঠোঁটে রং লাগানো পুতুল তোমাকে আর মানাবে না।

বিদায়—বিদায়—বিদায় তোমাকেও সুদূর পাঞ্জাববাসী পুত্র আমার!

[রণক্ষেত্রে তাঁর স্বামী প্রাণ বিসর্জন দেন—মুক্তি যুদ্ধে একটি অঞ্জলিবদ্ধ আহুতির মত। তারপর শ্রীমতী ম তাঁর খাতায় এই ক'টি কথা লিখে রাখেন!]

আমি হতভাগ্য নারী। যে আঘাত আমি পেয়েছি তার থেকে কোনদিন মুক্তি নেই। প-এর স্মৃতি আমায় দিন রাত্রি বিঁধছে। আমি সারা বাড়ীতে তার কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হ'তে শুনছি—

আমি কেঁদেছি—পুরো দুটি দিন দুটি রাত্রি কান্নার জলে আমার বিছানা ভিজে গেছে। কি অভিশাপ—হে ভগবান কি অভিশাপ আমার তরে তুমি রেখেছিলে। আমি ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধকে ভালবাসি; আমরা দুজনে তার জন্যে একই সঙ্গে কাজ করেছি। তাও আজ শেষ হয়ে গেল!...

...প'-এর শেষ দৃশ্য আমাকে পীড়া দেয়। ক—যখন সব বর্ণনা করছিলেন আমার চোখের সামনে ছবিটা যেন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল। সে আমি আর ভুলতে পারি নি। তাঁর কথাগুলো আমার কানে বাজছে—

'ওরা শত্রুর একটা বিরাট অস্ত্রাগার উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করছিল। সে জানতো এর মধ্যে বিপদ ঘুমিয়ে আছে। সেইজন্যই এই চরম কাজটি তার অন্য কোন সহকারীকে সে করতে দেয় নি। ব্রহ্ম সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের মাটিতে সে মৃত্যুকে বরণ করেছে। তুমি শোক করো না, কারণ সে শোক করে নি। কাজ সম্পূর্ণ করবার পর ওরা যখন একটা নালার থেকে ওকে খুজে বার করলে, তখন দেখলে তার বাঁ হাতখানা উড়ে গেছে আর সর্বশরীরে ভীষণ আঘাতের চিহ্ন। সে বুঝতে পেরেছিল যে সে আর বাঁচবে না। সেইজন্যে সে তোমার ও অন্যান্য সহকর্মিদের জন্যে এই বাণীটি পাঠিয়েছিল: "বীরের মত এগিয়ে চল—তোমাদের এগিয়ে চলায় কোন বিচ্যুতি যেন না থাকে। ম'-কে—আমার প্রিয়া পত্নীকে বোলো যে আমি বীরের মত মরেছি। ভারতমাতা আজ আমায় ডাকছে। আমি জানি তার প্রতি আমার কর্তব্য আমি করে গেলাম। নেতাজী, আমি রক্ত দিয়েছি আমি জানি আমার এই রক্ত অন্য সৈনিকদের প্রেরণা দেবে। বন্ধুগণ এখানে আর দেরী করো না। তোমাদের কাজ করে যাও। আমি শীগগীরই মরে যাবো। শত্রুরা আমায় জীবন্ত পাবে না। যে পথে আমাদের ফৌজ জয় ও

মুক্তির দিকে এগিয়ে যাবে সেই পথ আমি আমার রক্ত দিয়ে রাঙ্গিয়ে দিলুম। নেতাজীর বাণী আমার মনে পড়েছে ঃ—

হামারে জওয়ানমার্দো কে খুন হামারী আজাদী কিম্মৎ হোগা। হামারে শহীদো কে খুন—উন্‌কি বাহাদুরী ঔর মর্দাঙ্গীসে হি হিন্দুস্থান কি মাঙ্গ পুরী হো সেকে গি। হিন্দুস্থানো পর জুলুম-ও-সিতাম তোড়নে ওয়ালে বর্তনভি জবরো সে আদলে কা বাধা শ্রিফ খুন সে হি লিয়া যা সেকে গা—জয় হিন্দ।"

এবং তার কথা যেই শেষ হল, সে তার রিভলভারটা বের করলে এবং অমানুষিক কষ্টের সঙ্গে নলটা মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে চাপ দিলে ঘোড়ার উপর...

জয় হিন্দ...জয় হিন্দ...জয়...

হাজার হাজার বীর রমণীর জীবন গাথার একটি ছিন্ন পত্র মাত্র। কিন্তু তবু আমাদের কানে বাজছে ঃ 'নেতাজী, আমি আমার রক্ত দিয়েছি—...।

রাবণের চিতার মত জ্বলছে এ রক্তের লাল আগুন—মানসপটে!

পরিশিষ্ট

(গ)

কাগজে প্রকাশিত নেতাজীর পলায়ন কাহিনীর সারাংশ—

১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস। দারুণ শীত! চারদিকে বরফ পড়ছে। এই সময়ে কাবুলের এক দোকানে দুটি লোক বসে আছে। একজনের নাম উত্তমচাঁদ আর অপর জনের নাম অমরনাথ—উত্তমচাঁদের সহকারী। দারুন শীত

পথে ঘাটে লোক নেই। এমন সময় দাড়িওয়ালা এক পেশোয়ারীর আবিভাব হল। উত্তমচাঁদ পরিচয় ও উদ্দেশ্য জানতে চাইলে অতিথি অমরনাথের জন্য যেন ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। উত্তমচাঁদ অমরনাথকে চা আনতে পাঠিয়ে দিলে আগন্তুক তাঁর পরিচয় দিলেন। বল্লেন তিনি একজন ভারতীয়,—কোন রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁর সাহায্য পেতে এসেছেন। নাম ভগৎরাম ও বাড়ী মর্দান জেলার খালাচের গ্রামে। তাঁর ভ্রাতা পাঞ্জাবের লাটকে গুলি করার অপরাধে দণ্ডিত হয়েছিলেন। খালাচের গ্রাম উত্তমচাঁদের খুব পরিচিত। তিনি ঐ গ্রামের নওজওয়ান সভার সম্পাদক ছিলেন। কাজেই আলাপ জমে গেল। ভগৎরাম স্পষ্ট করেই বললেন যে তিনি পলাতক সুভাষচন্দ্রের জন্য সাহায্য ভিক্ষা করতে এসেছেন। তিনি তাঁকে রাশিয়ায় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছেন। উত্তমচাঁদ চমকে উঠলেন।

ভগৎরাম বলে চললেন যে ১৩ দিন হল সুভাষচন্দ্র এখানে এসে উট ও গাধাওয়ালাদের এক জঘন্য আড্ডায় রয়েছেন। এখানে তাঁদের বিশেষ কেউ জানা শোনা নেই, তাই খুবই অসুবিধা হচ্ছে। সুতরাং তাঁদের একটা নিরাপদ আশ্রয়স্থান দরকার।

উত্তমচাঁদ বল্লেন তার বাড়ীতে সুবিধা হবে না। তবে কাছেই তাঁর বিশি বন্ধু হাজি সাহেবের বাড়ী। হাজি সাহেব সেনাদলে কাজ করতেন এবং ১ বৎসর আগে বৃটিশ অফিসারদের সঙ্গে ঝগড়া হওয়ায় পদত্যাগ করে চলে আসেন তিনি জাপান, জার্মান প্রভৃতি খুব ঘুরেছেন। তাঁর স্ত্রী জার্মান। তাছাড়া তিনি একদিকে যেমন বৃটিশ বিদ্বেষী তেমনি সুভাষচন্দ্রের অনুরাগী। সুতরাং তাঁর মোজা ও গেঞ্জীর কারখানা আছে, সেখানে একটা ব্যবস্থা করলেও করতে পারেন। যাবার আগে ভগৎরাম বলে গেলেন যে বর্তমানে তাঁরা দুজনেই ছদ্মবেশে আছেন ও ছদ্মনাম ব্যবহার করছেন। তাঁর ছদ্মনাম রহমৎ খাঁ আর সুভাষচন্দ্রের ছদ্মনাম জিয়া উদ্দীন।

ভগৎরাম বা রহমৎ খাঁর প্রস্থানের পর উত্তমচাঁদ কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়লেন কিন্তু তাঁর এই দুর্বলতা জয় করতে বিশেষ সময় লাগলো না। তিনি হাজি সাহেবের বাড়ীর দিকে চললেন। কিন্তু তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ হল না।

বিকেল বেলা রহমৎ খাঁ এসে হাজির হলেন। উত্তমচাঁদ ও তিনি কথামত কাবুল নদের সেতুর ওপর গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের দেখা হল। সুভাষচন্দ্রের পরণে একটি ময়লা শালোয়ার ও ময়লা সার্ট। পায়ে বরফে ভেজা মোজা। মুখে তিন ইঞ্চি লম্বা দাড়ি, কিন্তু চোখে চশমা না থাকায় উত্তমচাঁদের তাঁকে চিনতে কষ্ট হয়েছিল।

চারিদিকে তখন প্রবল তুষারাপাত হচ্ছে। সুভাষচন্দ্রের অনভ্যস্ত আবহাওয়ায় পথ চলতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। তাছাড়া সকলের সন্দেহ এড়িয়েও তাঁকে চলতে হবে। যাই হোক বাড়ী পৌঁছে উত্তমচাঁদ তাঁর পোষাক বদলাতে সাহায্য করলেন। তার পর চায়ের ব্যবস্থা করলেন। সুভাষচন্দ্র উত্তমচাদের এই আত্মীয়তায় খুবই সন্তোষ বোধ করলেন।

এই সময় সুভাষবাবু উত্তমচাঁদের কাছে তাঁর এই বিচিত্র ভ্রমণকাহিনীর কিছু কিছু বর্ণনা করেন। তিনি বলেন কোনগতিকে কাবুলে এসে পৌঁছলেও তাঁর এবং রহমৎ খাঁর দুজনেরই অচেনা জায়গার জন্য খুবই অসুবিধা হয়েছিল। মুস্কিল হয়েছিল আশ্রয়স্থান নিয়ে। স্থানীয় লোকেরা লাহোর গেটের কাছে যে সরাইযেব কথা বলে দিলে সেখানে এসে দেখা গেল যে সেটা একটা গাধা ও উটওলাদের আস্তাবল। যাই হোক দোতলায় এক টাকা (আফগানী) ভাড়ায় একখানা অন্ধকার কুঠুরী পাওয়া গেল। সেইখানেই তাঁরা উঠলেন। ভীষণ শীত—আগুন জ্বালাতে হয়। কিন্তু ধোঁয়া বেরোবার পথ নেই। তবু কোনমতে তাঁরা ত রইলেন। সন্ধ্যাবেলার দিকে রহমৎ খাঁ চা, রুটি ও কাবাব নিয়ে এলেন। এবং দুজনে মিলে তার সদ্ব্যবহার করলেন। রাত্তিরের জন্যে দৈনিক আট আনা ভাড়ায় এক একটি বিছানা জোগাড় করা হল চৌকিদারের কাছ থেকে।

কয়দিন ধরেই একটা আফগান গোয়েন্দা ওঁদের পেছনে ঘোরাফেরা করছিল। একদিন লোকটা সরাসরি তাঁদের কুঠরীর সামনে এসে তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে বসলো। রহমৎ খাঁ বললেন যে তাঁরা মুসাফির—সীমান্ত থেকে এসেছেন। তার পর সুভাষবাবুকে দেখিয়ে বললেন ইনি তাঁর ভাই—কালা ও বোবা—অসুখে ভুগছেন, তাঁকে নিয়ে সাখি সাহেবের তীর্থে যাবেন কিন্তু বরফ পড়ার জন্য রাস্তা বন্ধ বলে যেতে পারছেন না। এসব শুনে লোকটা প্রথমটা খুব খানিকটা মেজাজ দেখালে, বললে থানায় যেতে হবে তাঁদের ইত্যাদি। কিন্তু তারপর রহমৎ খাঁ একখানি আফগানী দশ টাকার নোট তার হাতে গুঁজে দিতে লোকটা আপ্যায়িত হয়ে চলে গেল।

টাকা পাওয়ার ফলে লোকটা লোভে লোভে এসে ভয় দেখিয়ে আব একদিন ৫ টাকার নোট নিয়ে গেল! আর একদিন এসে বললে দারোগা সাহেব তাঁদের বিদ্রোহী মনমদ দলের লোক বলে সন্দেহ করছেন সুতরাং থানায় যেতেই হবে ইত্যাদি। অগত্যা সেদিন ১৭ টাকা দিয়ে তাকে বিদায় করতে হল। তাছাড়া টাকার সঙ্গে সুভাষবাবুর দামী হাত ঘড়িটা পর্যন্ত আদায় করে নিয়ে যেতে ভুললো না। পরের দিন লোকটা এসে জানালো যে দারোগা তার কাছ থেকে ঘড়িটা নিয়েছে সুতরাং রহমৎ খাঁর আরও ৫টি টাকা খসলো। লোকটা রোজই বলতো তোমরা যত শীগগীর পারো এখান থেকে চলে যাও আর এঁরাও ভেতরে ভেতরে উত্তমচাঁদের খোঁজ খবর করছিলেন। সুতরাং দুদিন খোঁজাখুঁজির পর উত্তমচাঁদেব সঙ্গে দেখা হওয়ায় সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

সেদিত রাতে সুভাষবাবু বসে বসে বেতারবার্তা—বিশেষ কবে যুদ্ধ সংবাদ শুনলেন। তিনি বললেন বহুদিন তিনি যুদ্ধ সংবাদ শোনেন নি! পরে অবশ্য উত্তমচাঁদ সিভিল এবং মিলিটারী গেজেট আনিয়ে তাঁকে পড়িয়েছিলেন।

সে রাতে উত্তমচাঁদের স্ত্রী একরকম জোর করেই উত্তমচাঁদের কাছ থেকে বলিয়ে নিলেন তাঁদের এই নতুন অতিথির আসল পরিচয় কি? এবং প্রথমটা

এতে ভয় পেলেও পরবর্তীকালে দেখা গিয়েছিল যে, ৪৮ দিন সুভাষবাবু ওঁদের কাছে ছিলেন ততদিন উত্তমচাঁদের স্ত্রী তাঁকে সর্বরকমে সাবধান করে রেখেছিলেন।

সুভাষবাবু উত্তমচাঁদের কাছে কোলকাতা থেকে কাবুলের যাত্রাকাহিনীর যে বর্ণনা করেছিলেন তা এইরকম।

তিনি বলেন যে দু'মাস আগে যদি তিনি বেরিয়ে পড়তে পারতেন তাহলে মস্কো যাওয়া বিশেষ অসুবিধা হত না। কিন্তু কর্পোরেশনের একটা কাজ থাকায় তাঁর দেরী হয়ে যায় এবং ফলে তাঁর সঙ্গী মস্কো যাত্রা করেন বটে কিন্তু তাঁর যাওয়া হয় না। তাছাড়া ততদিন তাঁর দাড়িও বিশেষ গজায় নি।

পলায়নের কিছুদিন আগে থেকে লোকের সঙ্গে দেখা করা বা কথা কওয়া একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিলেন কিন্তু পলায়নের কাজে যাঁরা সাহায্য করছিলেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় ছিল। এবং সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেলে ১৫ই জানুয়ারী রাত আটটার সময় মৌলবীর বেশে বাড়ী ছেড়ে বেড়িয়ে পড়েন। পেশোয়ারের পথে ট্রেনে সহযাত্রিদের কাছে তিনি নিজেকে জিয়াউদ্দীন বলে পরিচয় দেন এবং স্টেশন এলেই কাগজ দিয়ে মুখ আড়াল করে রাখেন।

পেশোয়ারে পৌছে অপেক্ষমান নির্দিষ্ট গাড়ীতে উঠে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে পৌছলেন। পেশোয়ারে দুদিন থাকার পর তিনি কাবুল যাত্রা করলেন। এই পথ অত্যন্ত দুর্গম এবং বিপদ সঙ্কুল। অবশ্য অনেকে তাঁকে এই সময়ে সাহায্য করেছিলেন বিশেষ করে লালপুরার খান সাহেব। তিনি তাঁকে একটি বিশেষ পরিচয় পত্র লিখে দিয়েছিলেন। তবে এই সময়ে তাঁর প্রধান সঙ্গী ছিলেন রহমৎ খাঁ। আর প্রায়ই তাঁর দেহরক্ষী হিসাবে দুজন করে বন্দুকধারী পাঠান তাঁর সঙ্গে থাকতেন। তবে এই সময় থেকেই সুভাষবাবু বোবা-কালা সেজে থাকতেন। পথিমধ্যে কি ভাবে ভিস্তির থলেয় চড়ে নদী পার হয়েছিলেন এবং বরফ-পড়া রাত্রির মধ্যে খোলা লরী চড়ে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করেছিলেন তা সত্যিই চিত্তাকর্ষক।

কাবুলে এসে রাশিয়ার দূতাবাসের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করে তিনি ব্যর্থ হন কারণ রাশিয়ার দূতাবাসে তাঁর পরিচিত কেউ ছিল না। তারপর তিনি ইতালীর দূতাবাসে যান। সেখানে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী সিনর কারোনি এবং জার্মান ব্যবসায়ী টমাস তাঁর রোমে যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দেন।

উত্তমচাঁদের বাড়ীতে থাকবার সময় সুভাষবাবু একান্ত সাবধানতার সঙ্গে থাকতেন। যখনই তাঁরা ঘরে বসে কথা কইতেন তখন ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখা হত। উত্তমচাঁদ বেরোবার সময় তাঁর ঘরে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে যেতেন। এমন কি বেতারে বাংলা গান পর্যন্ত তিনি শুনতেন না পাছে অন্য লোকে সন্দেহ করে। কিন্তু তবু উত্তমচাঁদের এক ভাড়াটে একদিন তাঁকে দেখতে পায় এবং তিনি যে কে তা আর বুঝতে বাকী থাকে না। ব্যাপার দেখে সেই ভদ্রলোক এমনই ভয় পেয়ে যান যে তিনি নিজেই বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। ব্যাপারটা পাছে ছড়িয়ে পড়ে তাই উত্তমচাঁদ সুভাষবাবুকে দিনকতকের জন্য এক সরাইখানায় পাঠিয়ে দেন। এই সময়ের মধ্যেই ইটালীয় রাজদূত কারোনির স্ত্রী এসে খবর দেন যে রোম থেকে চিঠি এসেছে। চিঠিতে ছাড়পত্র পাবার কথা কিছু ছিল না।

এদিকে সরাইখানাতে সুভাষবাবু আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর সেবাশুশ্রূষার জন্যে উত্তমচাঁদ তাঁকে নিজের বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। এই সময় সুভাষবাবুর প্রায়ই কাশি হত এবং সেই কাশি পাছে অন্য কেউ শুনতে পায় তার জন্যে কাশির সঙ্গে সঙ্গেই উত্তমচাঁদের স্ত্রী জোরে জোরে আওয়াজ করে কাশির আওয়াজ চাপা দেবার চেষ্টা করতেন।

দেখতে দেখতে তিন সপ্তাহ কেটে গেল কিন্তু ছাড়পত্রের ব্যবস্থা হল না। কারোনি বললেন বোধ হয় মস্কোর ইতালীয় দূতাবাসে এই নিয়ে কিছু গণ্ডগোল হয়ে থাকবে। প্রকৃতপক্ষে হয়েছিলও তাই। তখন সুভাষবাবু স্থানীয় জার্মান বা রাশিয়ানদের সাহায্যে রাশিয়ার দূতাবাসের সঙ্গে আবার যোগসাধনের চেষ্টা

করাতে লাগলেন কন্তু মনোমত ফল পেলেন না। এর মধ্যেই কারোনি এসে জানালেন যে চিঠি এসেছে। এই চিঠিতে জানানো হয়েছে যে আভ্যন্তরিক গণ্ডগোল কোন রকমে মিটেছে এবং সুভাষবাবুর জন্যে রোম থেকে বার্তাবাহক আসছেন।

ক্রমাগত বাড়ীতে থেকে সুভাষবাবু হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। তবে বাইরে বেরোতে গেলে কাবুলি বেশ ধারণ করাই ভাল। উত্তমচাঁদ তাঁকে যে পোষাক দিলেন তা তাঁর গায়ে বেশ হল, কিন্তু জুতোটা একটু কড়া হল। অগত্যা সুভাষবাবু জুতো কিনতে কাবুলির বেশে রাস্তায় বেরোলেন। যে দোকানে জুতো কিনতে গেলেন দোকানী তাঁকে দেখেই ভারতীয় বলে আন্দাজ করেছিলেন। সুভাষবাবু নিজে হাবিবিয়া কলেজের অধ্যাপক জিয়াউদ্দীন বলে পরিচয় দিয়ে বসলেন। দোকানী বললেন হাবিবিয়া কলেজের সব অধ্যাপককেই তিনি চেনেন কিন্তু তাঁকে চিনতে পারছেন না। অগত্যা সুভাষবাবু বলতে বাধ্য হলেন যে তিনি নতুন এসেছেন ঐ কলেজে এবং কোনমতে কাজ শেষ করে তাড়াতাড়ি আছে বলে সরে পড়লেন।

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মধ্যে উত্তমচাঁদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি রাশিয়ায় যাবার জন্যে এত ব্যস্ত কেন! সুভাষচন্দ্র বলেন যে বর্তমান অবস্থায় রাশিয়াই একমাত্র ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করতে পারে। যদিও রাশিয়া ও জার্মানের মধ্যে আপাত প্রীতি সম্বন্ধ যে কোন দিন ভেঙ্গে যেতে পারে তবু অন্তরে অন্তরে রাশিয়ার সঙ্গে ইংরাজের মিল হতে পারে না। ইংরাজ দু'শ বছরের শাসনে ভারতকে যেরকম দুর্বল করে দিয়েছে তাতে সেখানে সশস্ত্র বিপ্লব সুরু করা শক্ত। কিন্তু রক্তক্ষয়কারী বিপ্লব এবং বিদেশী শক্তির সাহায্য ব্যতীত ভারতের মুক্তি সম্ভব নয়। অথচ ভারতবর্ষে জেলের মধ্যে পচে পচে এ দুটোর কোনটাই করা সম্ভব নয়। একমাত্র পথ দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে কোন শত্রুর দেশে গিয়ে হাজির হয়ে প্রচারকার্য চালানো। সেই দিক থেকে রাশিয়াই

প্রশস্ত স্থান। একমাত্র রাশিয়াই ভারতকে মুক্ত করতে পারে। এই যুদ্ধই হচ্ছে তার শুভক্ষণ। এই শুভক্ষণের সুযোগ সদ্ব্যবহার না করতে পারলে ভারতের স্বাধীনতা আরও পঞ্চাশ বছর পেছিয়ে যাবে। উত্তমচাঁদ বলেন যে জার্মানী বা চক্রশক্তির অনুকূলে সুভাষবাবু একটা কথাও বলেন নি। চক্রশক্তিকে তিনি ইংরাজের মতই ঘৃণা করতেন। অথচ তিনি বলেছেন যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে বছর কুড়ি ধরে একজন শক্তিশালী ডিক্টেটরের অধীনে শাসিত হওয়ার প্রয়োজন আছে কারণ তা না হলে ভারতবর্ষের ভেতরকার নানা রকম বিভেদ দূর হতে পারে না। তিনি বলেছিলেন তুরস্কের মত ভারতবর্ষেও কামাল পাশার মত একজন নেতার প্রয়োজন। রাশিয়ায় যাবার আন্তরিক ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও রাশিয়া ও জার্মাণীর মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাওয়ায় তা অবশ্য সম্ভব হয় নি। তাই তিনি বাধ্য হয়েই বার্লিন যাত্রা করেন।

সুভাষবাবুর মস্কোতে যাওয়ার ব্যগ্রতা দেখে উত্তমচাঁদও নানারকম উপায়ের সন্ধান করতে লাগলেন। রাশিয়ার সীমান্ত থেকে একজন ফেরার খুনী আফগানিস্থানে এসে বাস করছিল, উত্তমচাঁদ তাকে চিনতেন। আফগানিস্থান ও রাশিয়ার মধ্যে রয়েছে হ্যাংগো নদী, এই নদী পার হতে পারলেই রাশিয়া যাওয়া যায়। অনেকে এই নদী দিয়ে গোপনে চোরাই মাল পারাপারের কারবার করতো এবং ঐ খুনী লোকটা ওদের সঙ্গে যুক্ত ছিল। লোকটার আর্থিক অভাবও ছিল প্রচুর। এই লোকটিই সাতশো আফগানী টাকার বিনিময়ে সুভাষবাবুকে ও রহমৎ খাঁকে হ্যাংগো নদী পার করে রাশিয়ায় পৌঁছে দিতে রাজী হয়। এই লোকটির নাম 'ম'।

উত্তমচাঁদ রহমৎ খাঁর সঙ্গে ম'র পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং তাঁরা সব ব্যবস্থা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে কারোনির স্ত্রী এসে জানিয়ে গেলেন যে শীঘ্রই নাকি রোম থেকে সব ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এদিকে আবার নতুন বিপদ দেখা দিল। উত্তমচাঁদের এক ব্যবসায়ী বন্ধু

জীবনলাল প্রায় প্রতি বৎসরই কাজের জন্য এই সময়ে তাঁর বাড়ীতে আসতেন। তিনি এসে পড়ায় একটু মুস্কিল বাধলো। অবশ্য স্ত্রীর অসুখের অজুহাত দেখিয়ে উত্তমচাঁদ জীবনলালকে তাঁর বাড়ীতে উঠতে দিলেন না কিন্তু একদিন ঘটনাচক্রে 'ম' ও রহমৎ খার সঙ্গে যখন তিনি কথা কইছিলেন তখন জীবনলাল এসে উপস্থিত হলেন। জীবনলাল ম'কে চিনতেন তাই তিনি এই জুয়াড়ীটার সঙ্গে উত্তমচাঁদের সম্বন্ধ আছে দেখে রেগে উঠলেন। তখন কোনগতিকে এড়িয়ে গেলেও সেদিনই দুপুরে উত্তমচাঁদ 'ম'কে যখন একখানি ১০০ টাকার নোট দিচ্ছিলেন সেই সময় জীবনলাল এসে পড়লেন। জীবনলাল আন্দাজ করছিলেন ভেতরে একটা ব্যাপার আছে কিন্তু উত্তমচাঁদ সুভাষবাবুর সঙ্গে আলোচনা না করে সমস্ত কথা প্রকাশ করা সমীচীন বোধ করলেন না। প্রকৃত পক্ষে সুভাষবাবুও যতদিন না তিনি চলে যাচ্ছেন ততদিন প্রকাশ করতে বারণ করে দিলেন। এদিকে ম' এর ব্যবস্থা সব ঠিক, অথচ যেদিন যাওয়া হবে তার আগের দিন কাবোনির স্ত্রী জানিয়ে গেলেন যে সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেছে। রোম থেকে বার্তাবাহক যাত্রা করেছে। তবে তার আগে সুভাষবাবুর একখানা ফোটো নিতে হবে। এবং তাঁরা গোপনে সুভাষবাবুকে গাড়ী করে নিয়ে গিয়ে ফোটো তুলে আনবেন। অগত্যা রহমৎ খা ম'কে জানালেন যে তাঁর অপর বন্ধুটি যাঁর যাবার কথা ছিল তিনি অসুস্থ হয়ে পড়াতে এখনও কাবুলে এসে পৌছতে পারেন নি। এই অপর বন্ধুটির (অর্থাৎ সুভাষবাবুর সঙ্গে ম' এর অবশ্য এযাবৎ পরিচয় হয় নি।

প্রশ্ন উঠলো কোন পথে সুভাষবাবু যাবেন। রহমৎ খা ও উত্তমচাঁদের মতে ম'এর সঙ্গে যাওয়াই ভাল কিন্তু সুভাষবাবুর নিজের মত অন্যরূপ। তিনি বললেন যে রাশিয়ান্‌রা একবার তাঁকে সাহায্য করতে অসম্মত হয়েছে অথচ ইটালিয়ানরা সব রকম ব্যবস্থা নিজের থেকেই করেছে। সুতরাং প্রথমে ইটালীতে যাওয়াই সঙ্গত. সেখান থেকে মস্কো যাওয়া সহজতর হবে। তাছাড়া ম'এর পথ বিপদসঙ্কুল যে কোন মুহূর্তে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

এর মধ্যে কারোনি আবার এসে জানালেন যে ফোটো খুব সুন্দর হয়েছে এবং অন্যান্য ব্যবস্থাও সব প্রস্তুত।

যাবার আগে দরকারী জিনিষপত্র সব কেনাকাটা করা হতে লাগলো। হাজি সাহেবের দর্জিকে দিয়ে সুভাষবাবুর দুটো পোষাক তৈরী করা হল। এর মধ্যে সুভাষবাবু একদিন জীবনলালকে দেখা দিয়েছিলেন, অবশ্য সেটা জীবনলালকে বহু অনুনয় বিনয়ের ফলে। সেইজন্য পরবর্তীকালে জীবনলাল গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

এর পর ইটালীয় দূত জানিয়ে গেলেন যে ১৮ই মার্চ তাঁর যাওয়ার দিন ঠিক হয়েছে। ১৬ই মার্চ সিনরা কারোনি এসে তাঁব স্যুটকেশ নিয়ে গেলেন। ১৪ই মার্চ হাজি সাহেব সুভাষবাবুকে মধ্যাহ্ন ভোজনে সম্বর্দ্ধিত করলেন।

নির্ধারিত দিনে বেলা ৯টার সময় সুভাষচন্দ্র দুজন জার্মান ও একজন ইটালীয়ানের সঙ্গে যাত্রা করলেন। ছাড়পত্রে তাঁর নাম লেখা ছিল তারাতাইন। পরে খবর আসে মস্কো হয়ে ২৮শে মার্চ তিনি বার্লিনে গিয়ে পৌছান।

তারপর আর ঘটনা নয়—ইতিহাস।

বেঙ্গল পাবলিশার্সের প্রকাশিত কয়েকখানি বাংলা বই

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

পঞ্চাশের মন্বন্তর (৪র্থ সং) ২৲

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

বৈদেশিকী (২য় সং) ৩৲

মনোজ বসুর

ভুলি নাই (৬ষ্ঠ সংস্করণ) ২৲

নূতন প্রভাত (৩য় সং) ১॥০

প্লাবন (২য় সংস্করণ) ১॥০

ওগো বধূ সুন্দরী ২৸০

পৃথিবী কাদের (২য় সংস্করণ) ১॥০

বনমর্ম্মর (২য় সংস্করণ) ২।০

সৈনিক (২য় সংস্করণ) ৩॥০

নরবাঁধ (৩য় সং) ২৲

মহেন্দ্রচন্দ্র রায়ের

ম্যাক্সিম গর্কী ৩॥০

পরম তৃষা ৩৲

সুবোধ ঘোষের

গ্রাম যমুনা ২৲

রঙ্গবলী ২৲

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা ৩য় সং) ২৲

উনপঞ্চাশী " ২৲

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের

সমাজ ও সাহিত্য (২য় সং) ২॥০

আজাদ হিন্দ গ্রন্থমালার

দিল্লী চলো—নেতাজী সুভাষচন্দ্র ২॥০

মুক্তি পতাকা তলে ২॥০

নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ ২॥০

আরাকান ফ্রন্টে ২৲

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের

জলে জাগে ঢেউ ২॥০

ভাগীরথী বহে ধীরে (২য় সংস্করণ) ২॥০

গোপাল ভৌমিক সম্পাদিত

১৩৫১র সেরা কবিতা ২৲

বিনয় ঘোষের

শ্রীবৎসের নানাপ্রসঙ্গ ২৲

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

কুড়িয়ে ছড়িয়ে ২৲

ভাবীকাল ২৲

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বিষের ধোঁয়া (৩য় সং) ৩৲

পঞ্চভূত ১৸০ লাল পাঞ্জা ১।০

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

আশাবরী ৩॥০

প্রবোধকুমার সান্যালের

কল্লান্ত ২৲

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

দিবারাত্রির কাব্য (২য় সং) ২৸০

নবেন্দুভূষণ ঘোষের

এই সীমান্তে ২॥০

গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দার

মা (ঋষিদাস অনূদিত) ২।০

নৃপেন্দ্রকুমার বসু

ফ্রয়েডের ভালবাসা ৩॥০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

বীতংস ২৲ দুঃশাসন ২৲

১৩৫১র সেরাগল্প ৩৲

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

কাঠ-খড়-কেরাসিন ১৸০

বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা